স্বস্তিকা

দাম ঃ পাঁচ টাকা

সংস্কৃত বিশেষ সংখ্যা - ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১১

संस्कृतेन लेखनम्
संस्कृताय जीवनम्

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তক মেলা ২০১১ ❑ নীতিন রায় ❑

বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তক মেলা ঃ ব্যাঙ্গালোর—২০১১ ❑ ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার ❑

বাম-রাজত্বে টোল শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতভারতী ❑ প্রণব নন্দ ❑

সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসারে বিদ্বৎজনের অভিমত ❑ ২৩

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের নিয়ম ❑ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ❑ ২৭

সংস্কৃত ভারতীর তিরিশ বছর ❑ চ মূ কৃষ্ণশাস্ত্রী ❑ ৩১

সংস্কৃত সেবায় নিয়োজিত এক জীবনব্রতী ❑ ৩৩

সম্পাদক।। বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক ।। বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ ব্যাঙ্গালোরে আয়োজিত বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তক মেলার আলোচনা মঞ্চ ।

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS
RNP-048/LPWP-028/2010-12

● R N I No. 5257/57

স্বস্তিকা

সংস্কৃত বিশেষ সংখ্যা

৬৩ বর্ষ ২৪ সংখ্যা,

১৫ ফাল্গুন, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১২

২৮ ফেব্রুয়ারি - ২০১১

সম্পাদকীয়

কর দূরিত ভারত লজ্জা

আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের এত বছর পরেও সমাজ ও রাষ্ট্রের কোনও ক্ষেত্রেই আমরা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পারি নাই। আমাদের সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির এমন কোনওদিক নাই যাহাকে আমরা একান্তই ভারতীয় বলিয়া দাবি করিতে পারি। অর্থাৎ আমরা আধুনিক হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদিগের আধুনিকতার সবটাই নকল করা, তাহাতে কোনও বিশুদ্ধ ভারতীয়তা নাই। মুখ্যত এই কারণেই আজ আমাদের দেশে আমরা ঐক্য সংহতি ও জাতীয়তাবোধের সমস্যায় জর্জরিত। দেশবাসীর মনে যথার্থ জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাইতে না পারিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভবও নয়। এই জাতীয়তা বা ভারতীয়তা বোধ জাগাইয়া তুলিতে হইলে আমাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসু মন লইয়া ফিরে যাইতে হইবে আমাদের অতীতে এবং খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে সেই সনাতনী ঐতিহ্যের ধারাটিকে যা শতসহস্র বছরের নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এই কাজে উদ্যোগী হইতে গেলে সংস্কৃত চর্চার উপর নির্ভরতা অনিবার্য হইয়া পড়ে। সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্যে যে তত্ত্ব ও তথ্য রহিয়াছে, বস্তুত তাহার মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের সনাতনী ঐতিহ্যের মর্মবাণী। কাজেই বলা যাইতে পারে যে এক অতি আধুনিক কারণেই বর্তমান সমাজে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া যায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে একটা হাওয়া তোলা হইয়াছে—বৈষয়িক জগতে সংস্কৃত কোনও কাজে লাগে না। এটা মিথ্যা। রাজ্যের ডব্লিউ বি সি এস বা আই. এ. এস-এর মতো সর্বভারতীয় পরীক্ষায় এই সংস্কৃতের সাহায্যেই অন্য রাজ্যের প্রতিযোগীরা বঙ্গ সন্তানদের পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া গিয়াছেন। এখন কম্পিউটার জানিতে চাহিলেও সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা লইয়া কিছু বলিতে চাহিলে বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের নাম করিয়া থাকেন সবাই। অথচ বিদ্যালয় স্তরে সংস্কৃতকে বাতিলের সময় কাহারও মনে হয় না, বঙ্গসন্তানদের সহজে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য ওই বিদ্যাসাগরই কী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া ব্যাকরণ কৌমুদী উপহার দিয়া গিয়াছেন। আর রবীন্দ্রনাথ? তিনি তো বারংবার বলিয়াছেন যে সংস্কৃতের তীর্থপথ ধরিয়াই তিনি তাঁহার শিক্ষাদর্শে পৌঁছাইতে চান। তাঁহার কথা, 'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়।'

এই 'চিরকালের চিত্ত' থেকে দেশকে বিচ্ছিন্ন করাই যাঁহাদের লক্ষ্য তাঁহারা সংস্কৃতকে সহ্য করিবেন কেন? এই জন্যই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত ব্রাত্য। বলা বাহুল্য সংস্কৃত অপসারণের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, ভারতীয় সংস্কৃতির মূলধারা সম্পর্কে কোনওরকম চৈতন্য বা ধ্যান-ধারণার উন্মেষ যাহাতে না ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা। সংস্কৃত ছাড়া ভারতীয় সংস্কৃতির জ্ঞানলাভ অসম্ভব। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সম্পদ, যুগ-যুগান্ত ধরে গড়ে ওঠা এদেশের সুবিশাল সাহিত্যকীর্তি যা সংস্কৃতে শাস্ত্ররাশিতে বিধৃত রহিয়াছে তাহাকে ছাড়া এই দেশের মূলে, গভীরে প্রবেশ করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নয়।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতের প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহার অথচ অন্যদিকে উর্দু-আরবী শিক্ষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের বৈষম্যমূলক আচরণে বহু ব্যক্তিকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে। সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন ধারক বাহক টোলগুলির কোনও উন্নতি আজও হইল না অথচ মাদ্রাসার ক্ষেত্রে উল্টো ছবিই প্রকাশ পাইয়াছে। আজ মাধ্যমিকস্তরে সংস্কৃতের প্রতি সরকার কী ধরনের গুরুত্ব দেখাইবেন—সেটা নতুন করিয়া চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে। কেননা, বাংলা ভাষার গঠনরীতি, বাংলা বানান ইত্যাদির দুর্দশা যে জায়গায় এসে দাঁড়াইয়াছে তা ভবিষ্যতের অশনি সংকেতের সূচনা। আমরা 'মন' বলি, কামনা'ও বলি কিন্তু 'মনকামনা' না বলিয়া 'মনস্কামনা' কেন বলি তাহা জানার জন্য সংস্কৃত প্রয়োজন। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের শতকরা ৪৫.৫ শতাংশ তৎসম এবং শতকরা ৫১.৫ শতাংশ তদ্ভব শব্দ। বহু শব্দেরই মূল সংস্কৃতে প্রোথিত। সংস্কৃত অন্যান্য ভারতীয় ভাষার শক্তি ও সঞ্জীবনের পরিপূরক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কৃতের প্রতি অবহেলা প্রকাশ করিলেও আশান্বিত হইবার মতো খবর হইল বঙ্গপ্রান্তে সংস্কৃতভারতী মনুষ্যগণকে যে পদ্ধতিতে সংস্কৃতশিক্ষায় পারদর্শী করিতে প্রচেষ্টা লইয়াছে তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই অনেকে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তক মেলা

নীতিন রায় ।। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থান, কর্ণাটক সরকার, সংস্কৃতভারতীসহ আরও কয়েকটি সংস্থার উদ্যোগে কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু শহরে পাঁচদিন ব্যাপী এক বড় মাপের আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা, সংস্কৃত কবি সম্মেলন ও সংস্কৃত বিষয়ক আলোচনা চক্রের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। গত ৬ জানুয়ারি বেঙ্গালুরু শহরের শৃঙ্গেরী মহল্লায় ন্যাশন্যাল স্কুল গ্রাউণ্ডে এই মেলার উদ্বোধন হয়। তৈরি হয় সংস্কৃত গ্রাম। উদ্বোধন করেন কর্ণাটকের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী বিশ্বেশ্বর হেগড়ে। সংস্কৃত গ্রামের উদ্বোধন করেন ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল নক্ষত্র অনিল কুম্বলে। সংস্কৃত গ্রামের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষা টেষ্ট ক্রিকেটের মতো। একজন ক্রিকেটারের দক্ষতা টেস্ট ক্রিকেটে প্রকাশ পায় আর ভাষার পারদর্শিতা সংস্কৃত জানার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এন গোপালস্বামী।

এই আন্তর্জাতিক আসরে বহির্ভারত, বহির্বঙ্গ ও দেশ বিদেশ থেকে দশ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সুদূর জম্মু-কাশ্মীর, মণিপুর, ত্রিপুরা ও অসম থেকে বহু মানুষ এই পুস্তক মেলায় যোগ দিয়েছিলেন। কেবল অসম থেকেই ৫০০ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বইয়ের স্টল ছিল ১৫৬ টি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কাঠিয়াবাবা প্রকাশনী এবং ইংল্যাণ্ড থেকে একটি প্রকাশন সংস্থা মেলায় যোগ দেন। এই মেলায় সংস্কৃত বইয়ের চাহিদা দেখে প্রকাশকেরা বিস্মিত। প্রায় ৫ কোটি টাকার উপর বই বিক্রি হয়েছে। পাঁচ দিনে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক এই মেলায় যোগদান করেছিলেন। বিভিন্ন দিনের কবি সম্মেলনে ২০ জন সংস্কৃত কবি তাঁদের রচিত কবিতা পাঠ করেছেন। ৫০০ উপর বই প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী, ছত্রিশগড় রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী, সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এম এন ভেঙ্কটচালাইয়া, বিচারপতি আর. সি. লাহোটী, বিচারপতি ডাঃ এম রামা জয়েস, অন্তরীক্ষ বিজ্ঞানী শ্রী ভি ভি বাট প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি. পুরন্দেশ্বরী, কর্ণাটকের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, সংস্কৃতভারতী সংস্থার কর্ণধার চ মু কৃষ্ণশাস্ত্রী প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা।

ব্যাঙ্গালোরে শোভাযাত্রা।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল বলেন, উত্তরাখণ্ডে দেবভাষাকে দ্বিতীয় রাজভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ঘোষণার পর বিদেশ থেকেও বহু ব্যক্তি অভিনন্দন জানিয়েছেন। খুব শীঘ্রই হরিদ্বার ও হৃষিকেশকে সংস্কৃত নগরীতে পরিণত করা হবে। এর জন্য আমজনতাকে সংস্কৃত শেখাতে পূর্ণকদমে প্রস্তুতি চলছে। ছত্তিশগড়ের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ছত্তিশগড়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে সংস্কৃত আবশ্যিক। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি যে অবহেলা তা সংস্কৃত শিক্ষার মাধ্যমে দূর করা যেতে পারে।

বিভিন্ন দিনের আলোচনাচক্রে ডঃ এস গুরুমূর্তি বলেন, আমাদের অর্থনীতিতে পাশ্চাত্যের সার্বিক প্রয়োগ সুখকর হবে না। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক জীবনের কথাও ভাবতে হবে। বৃটিশরা আমাদের দেশে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে বলে যা বলা হয় তা সত্য নয়। প্রথম শতক থেকে পঞ্চ দশ শতক পর্যন্ত ভারত মোট জাতীয় আয়ের নিরীখে (জি ডি পি উৎপাদনে) প্রথম ছিল, দ্বিতীয় ছিল চীন। তাই এ কথা বলা যেতেই পারে বৃটিশরাই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূত্রধার নয়। প্রাক্তন বিচারপতি রামা জয়েস মন্তব্য করেন, সংস্কৃত মেলার তিনদিন তার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিন। একটি প্যাণ্ডেলে ছিল বিজ্ঞান প্রদর্শনী। প্রথমে ঋষিদের সৃষ্টি রসায়ণ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, আবহাওয়া বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, চরক সংহিতা প্রভৃতির পরিচয় রয়েছে এই প্রদর্শনীতে। এছাড়াও রয়েছে প্রাচীন ভারতে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের পরিচয়। যেমন শক্তি অস্ত্র, পাশুপত অস্ত্র প্রভৃতি। ছিল বিভিন্ন ব্যূহ যেমন মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, চক্রব্যূহের ছবিসমূহ। প্রত্যহ ছিল সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। দুই দক্ষিণী গায়ক এস পি বালসুব্রামনিয়ম ও অর্চনা দেবীর সংস্কৃত সংগীত, সংস্কৃত পপগীত ও লোকগীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ধর্মভূমি নামে সংস্কৃত নাটক ও মঞ্চ স্থ হয়।

বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তকমেলা ব্যাঙ্গালোর – ২০১১

ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার

'আহা ! কী দেখিলাম ! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' গঙ্গাসাগর দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নবকুমার যদি একথা বলিতে পারে, তবে গ্রন্থসাগর দেখিয়া আমি কেন বলিতে পারিব না ? বিশেষতঃ সেই গ্রন্থসাগর যদি সংস্কৃত গ্রন্থের হয় !

আমরা বঙ্গীয় কায়স্থ সন্তান। আশৈশব শুনিতেছি, ইংরাজি না শিখিলে কুলকর্ম করিতে পারিব না; উদরান্ন জুটিবে না। কায়স্থের কুলকর্ম কলমপেশা;'কেরানিগিরি'। কথাটি সবার আগে বলিয়াছেন শূদ্রক, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে। যাহা হউক কুলকর্ম রক্ষার দায়ে আমরা সুপ্রাচীন কাল হইতে রাজভাষা শিখিয়া আসিতেছি। কখনও সংস্কৃত, কখনও আরবী-ফারসী; কখনও ইংরাজি। স্বাধীনোত্তর ভারতে আবার ইংরাজির সহিত হিন্দীর হাতল জুটিয়াছে।

এবছর ব্যাঙ্গলোরে আয়োজিত বিশ্ব-সংস্কৃত পুস্তক মেলায় ক্রিকেটার অনিল

ইহা তো গেল, কুলকর্মের কথা। এইবার জাতিধর্মের কথা বলি। ইংরাজের তল্পিবাহক বঙ্গজাতি 'হ্যাট-ম্যাট-ক্যাট-ব্যাট' বলিতে বলিতে ভারতে ছড়াইয়া পড়িল। আগে-ভাগে ইংরাজি শিখিয়া উন্নাসিক বঙ্গজাতি উড়ে-মেড়ো-খোট্টা-তেলঙ্গের সংস্পর্শ বাঁচাইয়া চলিতে শিখিল, ইংরাজি তাহার মনিব-ভাষা;সুতরাং বিশ্বভাষা। সেই ভাষা শিখিয়া বঙ্গজাতি আগমার্কা সাংস্কৃতিক হইয়া উঠিল। ব্যাপারটি কতকটি 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' এর মতন। যতদিন যাইতেছে, বঙ্গজাতির এই সাংস্কৃতিক ছুঁৎমার্গ ততই বাড়িতেছে। সে বলে, কলকাতা ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক রাজধানী। সংস্কৃতির খাতিরে সে প্রগতিশীল, প্রগতিশীলতার জন্যে সে কম্যুনিস্ট; আর কম্যুনিস্ট বলিয়াই সে প্রায় তিন যুগ যাবৎ উন্নত ও উন্নততর বামফ্রন্টের আঁতুড় ঘর। তার 'নন্দন' প্রীতির ফসল ঘরে ঘরে মাওবাদীর দল। প্রত্যহ খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি। নির্বিকার, নির্লিপ্ত, নপুংসক প্রশাসন। অথচ সংস্কৃতির ঘোমটা টানিতে টানিতে পশ্চাদ্দেশ উদোম হইয়া গেল সেদিকে নজর নাই। এতদিন ধরিয়া 'শয়তানি ইস্কুলে' যে ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে দিয়াছে, তাহার ফল কে ভোগ করিবে ? সংস্কৃত বিনা সংস্কৃতিচর্চার মূল্য কে চুকাইবে ?

কলিকাতা বইমেলার কথা বলি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' বহুদিন পূর্বে বলিয়াছিল; আমি কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছি। 'কমলাকান্ত' বাজারে গিয়াছে। মাছের বাজার হইতে বিদ্যার বাজার পর্যন্ত সকল বাজার ঘুরিয়া অবশেষে সাহিত্যের বাজারে গিয়াছে। সেখানে কী দেখিয়াছে ? —'সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। বাল্মীকী প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃতফল বেচিতেছেন। বুঝিলাম ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম আর কতগুলি মনুষ্য নীচু-পীচ-পেয়ারা-আনারস-আঙুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন—বুঝিলাম এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কিসের দোকান ? বালকেরা বলিল—'বাঙ্গালা সাহিত্য।' বেচিতেছে কে ? 'আমরাই' বেচি।... কিনিতেছে কে ? আমরাই। বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম খবরের কাগজ জড়ান 'অপক্ক কদলী'। বাঙলা সাহিত্যের যে কোনও সহৃদয় পাঠক উক্ত মন্তব্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারিবেন।

বঙ্গজাতি কলিকাতা বইমেলা নামক মাচা বাঁধে। আর লাভের গুড়ে কলসী ভরিয়া লইয়া যায় ভিনদেশী প্রকাশকরা। মেলা সাঙ্গ হইলে বঙ্গীয় কবি-সাহিত্যিক-লেখক-প্রকাশকরা দুই পদ প্রসারিত করিয়া কাঁদিতে বসেন। তাহাদের কান্নায় সংবাদপত্রের পাতা ভিজিয়া যায়। তাহার পর ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলগুলির বাপান্ত করিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া পরবর্তী মেলার জন্য প্রস্তুত হয়।

বঙ্গজাতি কলিকাতা বইমেলা নামক মাচা বাঁধে। আর লাভের গুড়ে কলসী ভরিয়া লইয়া যায় ভিনদেশী প্রকাশকরা। মেলা সাঙ্গ হইলে বঙ্গীয় কবি-সাহিত্যিক-লেখক-প্রকাশকরা দুই পদ প্রসারিত করিয়া কাঁদিতে বসেন। তাহাদের কান্নায় সংবাদপত্রের পাতা ভিজিয়া যায়। তাহার পর ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলগুলির বাপান্ত করিয়া চোখ মুছিয়া উঠিয়া পরবর্তী মেলার জন্য প্রস্তুত হয়। এখন আবার এক নূতন বায়না জুড়িয়াছেন—দুই বাঙলা, অসম, ত্রিপুরা লইয়া পৃথক একটি দেশ তৈয়ারী করিতে হবে; যাহাতে তাহাদের 'অপক্ক কদলী' গুচ্ছ মহামূল্যে বিকাইয়া যায়। কিন্তু ইহা তো প্রাথমিক শিক্ষা হইতে ইংরাজি তুলিয়া দিবার ন্যায় সহজ ব্যাপার নহে!

যাহা হউক, আমরা অমৃত ফলের বিশ্ববাজার দেখিলাম। দেশ বিদেশের ক্রেতা বিক্রেতায় সে বাজার পরিপূর্ণ। 'অমৃতফল খাইয়া সকলেই 'অমর হইতে চাহে'। প্রত্যহ সওয়া-কোটি টাকার সংস্কৃত বই বিক্রয় হইতেছে। কেবল 'গীতা' নামক অমৃতফলটি পাঁচদিনে পঁচিশ লক্ষ বিক্রয় হইয়াছে। আর বঙ্গীয় প্রকাশকের ভাণ্ডার শূন্য। সে তো সংস্কৃত ভাষাকে কবে মৃতভাষা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। কোনও এক দেবীর সুপরামর্শে সংস্কৃত ভাষাকে শিক্ষার অঙ্গন হইতে সম্মার্জনী সহযোগে বিদায় করিয়া প্রগতিশীল সাজিয়াছে। ভারতাত্মার সহিত আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সাংস্কৃতিক উদ্বাস্তু বঙ্গজাতি বিশ্ববাজারে শূন্য হাতদুটি কচলাইতেছে। কোটি কোটি টাকার লাভের গুড়ের একবিন্দুও তাহার ভাণ্ডে পড়িল না। হায় বাঙালী, তবু তুমি সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলো; যে ভাষায় আজও লক্ষ লক্ষ লোক মেলাপ্রাঙ্গণে অনর্গল কথা বলিতেছে। তোমার উন্নাসিকতা, তোমার বিজাতিপ্রীতি, বিজাতীয় আদর্শের অন্ধ অনুকরণ, তথাকথিত সংস্কৃতির অহংকার তোমাকে ভারতাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। তাই সমগ্র ভারত যেদিকে চলে, তুমি তাহার বিপরীত দিকে ধাও।

ব্যাঙ্গালোরের বসবনগুড়ি অঞ্চলে ন্যাশনাল হাইস্কুল ময়দানে বিশ্বসংস্কৃত পুস্তক মেলায় দাঁড়াইয়া এই কথাটি বারংবার মনে হইতেছিল— আমরা আত্মঘাতী বাঙালী, প্রগতিশীলতার মুখোশ পরিয়া কত দ্রুত গতিতে পিছনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। থাক, এবার মেলার কথা বলি। মেলাটি মূলতঃ চারভাগে বিভক্ত—বইমেলা, প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বইমেলাতে কেবল সংস্কৃত বই-বিপণি। দেশবিদেশের বহু প্রকাশক সংস্কৃত বইয়ের পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে। কলিকাতা হইতে এই যজ্ঞে মাত্র দুইটি প্রকাশক গিয়াছেন—'শ্রীধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট' এবং 'দি এশিয়াটিক সোসাইটি'। শ্রী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট-এর পক্ষে শ্রী বৃন্দাবনবিহারী দাস কাঠিয়াবাবার মতে, বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তকমেলা কুম্ভমেলার মতোই ব্যাপক ও বিশ্বজনীন। কুম্ভমেলায় যেমন বিশ্বের নানাপ্রান্ত হইতে মানুষ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আসেন; এখানেও তেমনি বিশ্বের নানাপ্রান্ত হইতে মানুষ আসিয়াছেন ভাবের আদান প্রদানের জন্য; জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদান প্রদানের জন্য। এশিয়াটিক সোসাইটির ভদ্রলোক একান্তে বলিলেন, এখানে যে সংস্কৃতে কথা বলিতে হইবে তাহা তাহার জানা ছিল না। তবে তিনি কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। প্রতিদিন প্রায় সওয়া কোটি টাকার সংস্কৃত বই বিক্রয় হইতেছে। ভাবিলেও অবাক লাগে বৈকি। শুধু 'গীতা' বিক্রয় হইয়াছে পঁচিশ লক্ষ কপি। নানা স্বাদের সংস্কৃত বই, পত্র-পত্রিকা, সিডি-ক্যাসেট, সবই বিক্রয় হইতেছে। সংস্কৃত বই যে এত জনপ্রিয় তাহা এই মেলাতে আসিয়া প্রথম বুঝিতে পারিলাম। মেলায় এক ব্যক্তির সহিত আলাপ হইল। পঞ্চাশ হাজার টাকার সংস্কৃত বই কিনিয়াও তাঁহার আশাপূরণ হয় নাই। তিনি বলিলেন, পাঁচ লাখ টাকা আনিয়া বই কিনিলে তবে একটু মনের মতো বই কেনা যায়। অবাক হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। কী কথা বলিতেছে! পাগল না কি?

এইবার বলি প্রদর্শনীর কথা। একটি 'জ্ঞানগঙ্গা' এবং অপরটি 'সংস্কৃত গ্রাম' এই দুইভাগে প্রদর্শনীটি বিভক্ত। জ্ঞানগঙ্গা আবার দুইভাগে বিভক্ত—একটি চার্ট, অপরটি মডেল মাধ্যম। চার্টের সাহায্যে ও চিত্রের সাহায্যে সংস্কৃতে বিজ্ঞানের যে বিশাল আলোচনা রহিয়াছে তাহার সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করিলাম। সামান্য দুই একটি কথা বলি—ঋগ্বেদে আলোর গতি বলা হইয়াছে সেকেণ্ডে ১,৮৫০১৬.১৬৯ মাইল; বর্তমান বিজ্ঞান বলে ১,৮৬০০০ মাইল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্তা আর্যভট্ট। বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা—জ্যোতির্বিজ্ঞান হইতে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সকল শাখায় প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত ভাষায় যে কত গভীর আলোচনা হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'জ্ঞানগঙ্গা' প্রদর্শনী দেখিয়া যে কোনও ভারতীয় গর্ব অনুভব করিবেন। আশ্চর্যের বিষয়, প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে বিজ্ঞানের এইসকল বিষয় ও সূত্র বাহির করিয়া, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সেগুলিকে বিচার করিয়া উপস্থাপিত করার পশ্চাতে যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা রহিয়াছে তাহা বিস্ময় উদ্রেক করে। 'সংস্কৃত ভারতী' প্রদর্শনী নির্মাণ করিয়াছেন। অসাধারণ মেধা, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা সর্বোপরি জাতীয়তাবোধ না থাকিলে এমন প্রদর্শনী করা অসম্ভব। যুদ্ধ বিদ্যাও বিজ্ঞান। প্রাচীন ভারতে যুদ্ধ বিজ্ঞান কেমন ছিল প্রদর্শনীতে অত্যন্ত নিপুণতার সহিত তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মহাভারতের যুদ্ধে যে সকল ব্যূহের কথা দেখি সেইসব ব্যূহ এই প্রদর্শনীতে নানাবিধ পুতুলের সাহায্যে তৈয়ারী করা হইয়াছে। চক্রব্যূহ, মকরব্যূহ, পদ্মব্যূহ ইত্যাদি ব্যূহ নির্মাণ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন ভারতে বিমান ও মহাকাশ গবেষণার সাজসরঞ্জাম দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। চিকিৎসাশাস্ত্রে তো উন্নতির কথা সবাই জানি। এখানে দেখিলাম প্লাস্টিক সার্জারী'র ব্যবস্থাও তখন ছিল। আর গণিত ও জ্যামিতির কথা ছাড়িয়াই দিলাম। শূন্যতত্ত্ব তো ভারতেই আবিষ্কৃত। বিজ্ঞানের সকল শাখা পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, কৃষি, সেচ, শিল্প ভাস্কর্য, আবাহাওয়া বিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ সকল বিষয়ে এত নূতন আলোকপাত করা হইয়াছে, যাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই সকল দেখিতে দেখিতে ভাবিতেছিলাম ভারতীয়দের ন্যায় এমন উন্নত একটি জাতি কিভাবে আজ অধঃপতিত হইয়াছে—ইহা কি বিধির বিধান? ভাবিয়া অবাক হইয়া যাই, প্রাচীন ভারতে এত নিপুণভাবে বিজ্ঞানচর্চা হইত। আর আজ আমরা শিখিতেছি ও শিখাইতেছি পাশ্চাত্য দেশ হইতেই আমরা বিজ্ঞান শিখিয়াছি। এই প্রদর্শনী দেখিলে বুঝা যায় কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্য দিয়া আমরা শিক্ষালাভ করিতেছি! প্রদর্শনীর আর একটি অঙ্গ—'সংস্কৃত গ্রাম'। প্রাচীন ভারতে গ্রামগুলি কেমন ছিল, গ্রামের দোকানপাট, বিদ্যালয়, পঞ্চায়েত, কামারশালা, কুমোরশালা প্রভৃতি কেমন ছিল, বাসগৃহ কেমন ছিল, যজ্ঞশালা কেমন ছিল, মঠ-মন্দির কেমন ছিল সব নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে। এককথায় প্রাচীন ভারতবর্ষের জীবনযাত্রার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'সংস্কৃত গ্রাম' প্রদর্শনী হইতে জানা যায়।

এইবার আলোচনা সভার কথা বলি। ইহাই পুস্তকমেলার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয়। এখানে নামী-দামী কোনও বাঙালী নাই। কারণ সে প্রগতিশীল। আর এই হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতার আঁশটে গন্ধে প্রগতিশীল বাঙালী নাসিকা কুঞ্চন করে। যাহা হউক, ৬-১-১১ তারিখ বিকাল পাঁচটায় মহাসমারোহে এই মেলা উদ্বোধন করিলেন কৃতি কর্ণাটক সন্তান বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রী অনিল কুম্বলে মহাশয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত উজ্জ্বল ব্যক্তিদের অন্যতম হইলেন শ্রী বিশ্বেশ্বর হেগড়ে কাগেরা—কর্ণাটক সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, শ্রী এন. গোপালস্বামী —প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার। আরও অনেক উজ্জ্বল তারকার উপস্থিতি লক্ষণীয়। উদ্বোধনী সভায় সকলে একবাক্যে স্বীকার করিলেন সংস্কৃতের ন্যায় ঐশ্বর্যময়ী ভাষা সারা পৃথিবীতে দুর্লভ। সংস্কৃত সকল ভারতীয় ভাষার জননী। তাহারই পুষ্টিতে সমস্ত ভারতীয় ভাষা পুষ্ট। সংস্কৃত সর্বার্থ সাধক ভাষা।

পরদিন ৭-১-১১ আলোচনাচক্রের মধ্যমণি, শ্রী এস. এন. ভেঙ্কটচালিয়া, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, সুপ্রীমকোর্ট। অন্যান্য উজ্জ্বল ব্যক্তিবর্গ হইলেন—শ্রী হংসরাজ ভরদ্বাজ, রাজ্যপাল কর্ণাটক সরকার। শ্রী বি. এস. ইয়েদুরাপ্পা, মুখ্যমন্ত্রী, কর্ণাটক। শ্রী রমেশ পোখরিয়াল, মুখ্যমন্ত্রী, উত্তরাখণ্ড এবং অন্ততঃ গোটা পনেরো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যমণ্ডলী;যাহার মধ্যে র্জামানীর হাসবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ও রহিয়াছে। এই আলোচনাচক্রের মূল বক্তব্য হইল সংস্কৃত জীবন্ত ভাষা, মৃতভাষা নহে। কারণ আজও যে কোনও ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে পুষ্টি সঞ্চয় করিতেছে। কোনও মৃত বস্তু অন্য কোনও বস্তুকে পুষ্টিদান করিতে পারে না। তাছাড়া বিশ্বের সমস্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় সংস্কৃতে প্রকাশ করা সম্ভব। সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষাই একমাত্র কমপিউটারের উপযুক্ত ভাষা। কারণ এ ভাষায় ব্দন্তঙক্কপ্র-এর আটসাঁট বাঁধন ছাড়াই মনের ভাব অনায়াসে বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ

বক্তব্য রাখছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডি পুরন্দেশ্বরী।

সংস্কৃত জীবন্ত ভাষা, মৃতভাষা নহে। কারণ আজও যে কোনও ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে পুষ্টি সঞ্চয় করিতেছে। কোনও মৃত বস্তু অন্য কোনও বস্তুকে পুষ্টিদান করিতে পারে না। তাছাড়া বিশ্বের সমস্ত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় সংস্কৃতে প্রকাশ করা সম্ভব। সর্বোপরি সংস্কৃত ভাষাই একমাত্র কমপিউটারের উপযুক্ত ভাষা। কারণ এ ভাষায় ব্দন্তঙক্কপ্র এর আটসাঁট বাঁধন ছাড়াই মনের ভাব অনায়াসে বিশুদ্ধ ভাবে প্রকাশ করা যায়; যাহা বিশ্বের কোনও ভাষায় সম্ভব নহে।

করা যায়; যাহা বিশ্বের কোনও ভাষায় সম্ভব নহে। দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী এম. রামা জোয়িস মহোদয়। বহু লেখকের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করিলেন। আজও এত সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয় দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কাব্য সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার নানা স্বাদের বই প্রকাশিত হইল। এই সভায় আরও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্থানাভাবে তাহাদের নামোল্লেখ করা সম্ভব হইল না। এইদিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কন্নড় চলচ্চিত্রের বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শ্রী রাজেশকৃষ্ণ সাধারণ সংস্কৃত পপ ও ব্র্যাণ্ডের গান গাহিয়া আসর মাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। অবাক হইয়া ভাবিতেছিলাম—ইহাও কী সম্ভব! সংস্কৃতে পপ সঙ্গীত!

পরদিন ৮-১-১১ তারিখের প্রভাতী সম্মেলন বিদূষীদের জন্য। সভানেত্রী শ্রীমতী অর্চনা চিটনিস, মধ্যপ্রদেশ সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী। এছাড়া বহু সংস্কৃতজ্ঞা বিদূষী যাহাদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। এই অনুষ্ঠানে মহিলাদের রচিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এইদিনের সভায় দেখিলাম মহিলাদের সংস্কৃত চর্চায় অবদান। মৃচ্ছকটিকে শূদ্রক পুরুষের গান গাওয়া এবং মহিলাদের সংস্কৃত পড়া লইয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তাহাকে উপেক্ষা করিয়া আজও যে ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী-গার্গী-লেপামুদ্রার ধারা শুষ্ক হইয়া যায় নাই, তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ আজিকার এই সম্মেলন। আজিকার মধ্যাহ্ন সম্মেলনের মুখ্য বিষয় 'বিজ্ঞান সম্মেলন', সভাপতি হিসাবে উপস্থিত রহিয়াছে ডঃ কে. রাধাকৃষ্ণন, সভাপতি, ইসরো। এছাড়া আরও নামী-দামী-বিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। এই সভার মূল বক্তব্য বিষয় ছিল, সংস্কৃত ভাষাতেই পৃথিবীতে প্রথম বিজ্ঞানচর্চা হইয়াছিল। আজও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমে নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের এমন কোনও বিষয় নাই; যাহা সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে চর্চা করা যায় না। এই ভাষা এতই ঐশ্বর্যময়ী যে, ইহাতে বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়, যাহা ভবিষ্যতে মানুষ আবিষ্কার করিবে তাহাও চর্চা করা যাইবে। এই দিনের সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত চলচ্চিত্র সঙ্গীত পরিচালক ও অসাধারণ গায়ক এস. পি. বালসুব্রহ্মণ্যম-এর উপস্থিতি ও সংস্কৃত গান কোনওদিন ভুলিব না। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ অনর্গল সংস্কৃত গান গাহিয়া তিনি দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্তব্ধ করিয়া দেন। ইহার গান শুনিয়া শেক্সপীয়রের একটি উক্তি মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন, খুন করিতে উদ্যত খুনীও গান শুনিলে খুনের কথা ভুলিয়া যায়। মহাকবি শেক্সপীয়র যথার্থ বলিয়াছেন।

পরের দিন ৯-১-১১ তারিক প্রভাতী অনুষ্ঠান যুবকদের। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ ডি. পুরন্দেশ্বরী, মানবসম্পদ উন্নয়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী, ভারত সরকার। আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় যুবক-যুবতীদের রচিত অসংখ্য সংস্কৃত বই প্রকাশ করা হইল। এই সভায় প্রমাণিত হইল যে, যুবসমাজের মধ্যেও সংস্কৃত ভাষা কত গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই দিনের মধ্যাহ্ন সভার সভাপতি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি আর. সি. লাহোটি মহোদয়। তাছাড়া কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এস. ডি. কুমারস্বামী। শ্রী ভি. ভাট মহাকাশ, সমুদ্র ও পারমাণবিক বিজ্ঞান কমিশনের মহাসচিব, ভারত সরকার। আরও কত যে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। এই আলোচনা সভার মূল বক্তব্য ছিল, একমাত্র সংস্কৃত ভাষাচর্চাই ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখিতে পারে। কারণ সংস্কৃত সর্বভারতীয় ভাষা, ইহার মধ্যে কোনও প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ নাই। বরং এই ভাষাতেই বিশ্বে প্রথম বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা, বিশ্বমৈত্রীর কথা বলা হইয়াছে। এই ভাষাতেই সর্বপ্রথম বলা হইয়াছে, 'আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতঃ' ঋগ্বেদ; 'বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান আমার মধ্যে আসুক'। বলা হইয়াছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—সমস্ত বসুধা আমার আত্মীয়। এইদিন সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ স্থ হয় এক অনিন্দ্যসুন্দর সংস্কৃত নাটক 'ধর্মভূমি'। অসাধারণ অভিনয় ও সংলাপ হাজার হাজার দর্শককে নিশ্চুপ করিয়া রাখিয়াছিল। নাটকের বিষয় আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।

'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ'— আজ ১০-১-১১ তারিখ। আজ মেলার সমাপ্তি। আজিকার প্রভাতী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া নানাবিধ প্রতিযোগিতা—ক্যুইজ, গান, আবৃত্তি আরও কত কী। এই সকল প্রতিযোগিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল, 'শলাকা পরীক্ষা।' নামটি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম আমাদের দেশের চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়কগাছে উঠিয়া কোমরে শলাকা বিঁধিয়া মানুষ যেমন ঘুরিতে থাকে ইহা বোধহয় সেইরূপ কোনও ব্যাপার। কিন্তু কোথাও তো চড়কগাছ দেখি না। অবশেষে দেখিলাম 'শলাকা পরীক্ষা' প্রাচীন ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত অন্যতম পরীক্ষা ব্যবস্থা। ছাত্র যে গ্রন্থের উপর পরীক্ষা দিবে সেই গ্রন্থটির মধ্যে কয়েকটি শলাকা (কাঠি) অনুপ্রবিষ্ট করা থাকিবে। পরীক্ষক মহাশয় যে কোনও একটি শলাকা ধরিয়া পুস্তক খুলিবেন। সেই পৃষ্ঠায় প্রথম শব্দটি পরীক্ষক বলিবেন। তাহার পর হইতে পরবর্তী শলাকা পর্যন্ত যাহা কিছু গ্রন্থে লেখা আছে; তাহা ছাত্রকে মুখস্থ বলিতে হইবে। পরে যাহা সে বলিল, তাহার ব্যাখ্যা করিতে

কুম্ভ মেলায় যেমন বিশ্বের নানাপ্রান্ত হইতে মানুষ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আসেন; এখানেও তেমনি বিশ্বের নানাপ্রান্ত হইতে মানুষ আসিয়াছেন ভাবের আদান প্রদানের জন্য; জ্ঞান বিজ্ঞানের আদান প্রদানের জন্য। এশিয়াটিক সোসাইটির ভদ্রলোক একান্তে বলিলেন, এখানে যে সংস্কৃতে কথা বলিতে হইবে তাহা তাহার জানা ছিল না। তবে তিনি কাজ চালাইয়া যাইতেছেন। প্রতিদিন প্রায় সওয়া কোটি টাকার সংস্কৃত বই বিক্রয় হইতেছে। ভাবিলেও অবাক লাগে বৈকি। শুধু 'গীতা' বিক্রয় হইয়াছে পঁচিশ লক্ষ কপি।

হইবে। এই পরীক্ষায় গুরুকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে শিষ্য উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। কী অসাধারণ মেধা ও মনীষার চর্চা প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় অনুস্যূত ছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এইসব সকৃৎগ্রাহী ছাত্ররাই সমগ্র বেদ মুখস্থ রাখিয়াছিল, তাই না বেদের অপর নাম শ্রুতি। আজও ছোট-ছোট ছেলেরা, যাহারা শলাকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মেধাও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। প্রসঙ্গতঃ বলি, আমাদের দেশে এখনও বহু মনীষী আছেন যাহাদের বেদ- বেদান্ত গীতা কণ্ঠস্থ। অবশ্য প্রগতিশীল বাঙালীর একথা বিশ্বাস হইবে না। কিন্তু আর একটি উদাহরণ দিলে বিশ্বাস হইবে। আজও বহু মুসলিম ছাত্র আছে যাহারা সম্পূর্ণ কোরাণ মুখস্থ রাখে। তাদের বলে 'হাফেজ'। এই কথাটি প্রগতিশীল বাঙালী অবিশ্বাস করিবে না। কারণ অবিশ্বাস করিলে পেটনের ভয় আছে; দুর্বল বাঙালী পেটনকে বড় ভয় পায়। তাছাড়া এই কথাটি বিশ্বাস করিলে আগমার্কা প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ সাজা যাইবে। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি র মূল কারণ ব্রহ্মচর্য। অথচ এইসব ছোটো-ছোটো ছাত্ররা যাহাতে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিয়া প্রতিভাশালী হইতে না পারে তাহার জন্য 'শয়তানি ইস্কুলে' 'জীবনশৈলী' নামের মোড়কে 'sex education' এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে কেহ কোরাণ-পুরাণ কিছুই মুখস্থ করিতে না পারে। আজকের সন্ধ্যায় একশত গায়ক-গায়িকা সংস্কৃত গান গাহিলেন। মনে হইল, ইহা যেন, দেবরাজ ইন্দ্রের সভা। তাহার সহিত নৃত্য পরিবেশন। হাজার হাজার দর্শক আমরা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া আছি। চোখের পলক পরিতেছে না। নিশ্চু প, নিষ্পন্দ সেই বিশাল সম্মেলন স্থান।

এই বিশাল অভূতপূর্ব মেলার উদ্যোক্তা 'সংস্কৃত ভারতী'কে কেবল শুষ্ক ধন্যবাদ দিয়া দায় সারিতে পারি না। এক কথায় আমরা তাহার নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকিব। এমন সুন্দর অনুষ্ঠান এত সুন্দর ভাবে পরিচালিত করা সত্যই বড় কঠিন। আমরা অনেক অনুষ্ঠান করি—বাঙালীর তো বারো মাসে তেরো পার্বণ। কিন্তু সে সমস্ত অনুষ্ঠানে কতই না ত্রুটি থাকে। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে কোথাও বিন্দুমাত্র ত্রুটি নাই। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আট হাজার প্রতিনিধির থাকা-খাওয়ার নিটোল নিখুঁত ব্যবস্থা আমাকে বিস্মিত করিয়াছে। সর্বোপরি স্বেচ্ছাসেবকদের অমায়িক আচার-ব্যবহার। আজও সেই কিশোর স্বেচ্ছাসেবকদের অনাবিল হাসি, অনর্গল সংস্কৃত কথা, আর অমায়িক ব্যবহার ভুলিতে পারি নাই। ভারতীয় সভ্যতার মূল বাণী 'অতিথি দেবো ভব'-কে এই স্বেচ্ছাসেবকরা মূর্ত রূপ দান করিয়াছে। কত নিষ্ঠা, কত পরিশ্রম এই মেলাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার পশ্চাতে রহিয়াছে তাহা অবর্ণনীয়।

বিশ্ব সংস্কৃত পুস্তকমেলার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যে সুর বাজিয়াছে তাহাকে ছাপাইয়া আমার হৃদয় বীণায় আর একটি সুর বাজিতেছিল—

'কেহ কাঁদে কেহ গাঁঠে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা,
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে চিরকাল একই খেলা।'

পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, জগৎ-মেলা হইতে বিদায় লইবার সময় বাঙালীকে যেন কাঁদিতে না হয়; সে যেন গাঁটে কড়ি বাঁধিয়া আপন ঘরে ফিরিতে পারে।

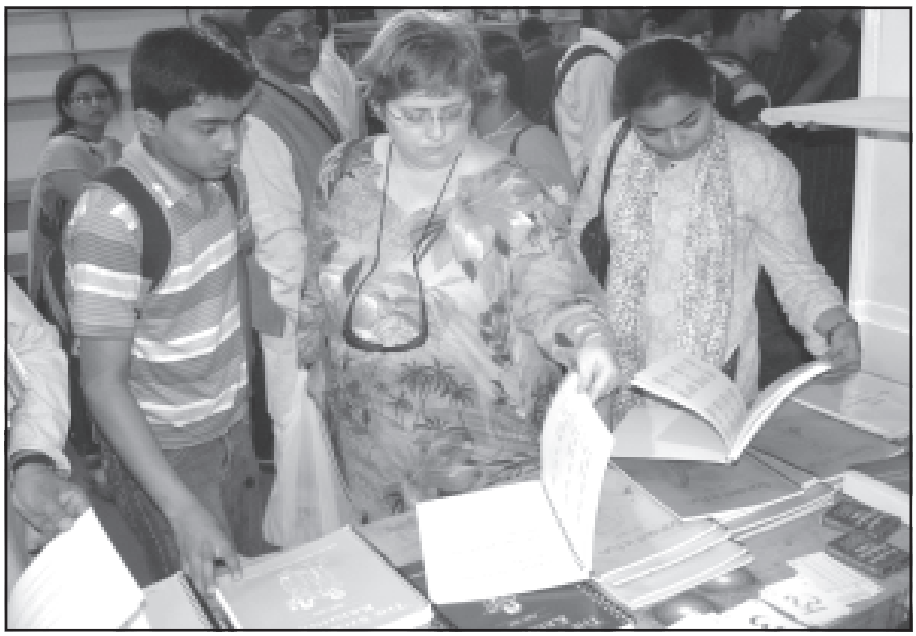

বইয়ের স্টলে অন্যান্যদের সঙ্গে এক বিদেশিনীও।

বাম-রাজত্বে টোল শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা

নবকুমার ভট্টাচার্য

আজ অনেকের কাছেই টোল বা চতুষ্পাঠী শব্দটি অপরিচিত হয়ে উঠেছে। অথচ একটু পেছনে তাকালে দেখব একসময় দেশের নানা প্রান্তে টোল ছিল অনেক। যেখানে নানা বিদ্যার পঠন-পাঠন চলতো সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে। ক্রিশ্চান মিশনারি এডাম ১৮৩৫-৩৮ সালের মধ্যে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিস্তৃত প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা থেকে জানা যায় সারা বাংলায় অন্তত ১৮০০ টোলে কমপক্ষে ১২,৬০০ অধ্যাপক শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮২৯ সালে উইলসন নদীয়া জেলা পরিদর্শন কালে ২৫টি টোলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেন এবং ওই সময় তিনি ৫০০ থেকে ৮০০ ছাত্রকে টোলে অধ্যয়ন করতে দেখেছিলেন। শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'বাঙালীর সারস্বত অবদান' নামক গ্রন্থে ১৯০০ সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে সকল অধ্যাপক টোলে নব্যন্যায়ের চর্চা করেছেন একমাত্র তাঁদের সংখ্যাই অর্ধলক্ষের বেশি হবে বলে অনুমান করেছেন। এডাম এই বিপুল সংখ্যক টোল অধ্যাপক এবং সংস্কৃত শিক্ষার প্রবহমান ধারাটিকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষা' গ্রন্থের শিক্ষা সমস্যা প্রবন্ধে বলেছেন, 'এই টোলের প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে, চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র পুঁথির পড়াটাই সবচেয়ে বড়ো জিনিস নয়, যেখানে চারিদিকেই অধ্যয়ন অধ্যাপনার হাওয়া বহিতেছে। গুরু নিজেও ওই পড়া লইয়াই আছেন। শুধু তাই নয়, যেখানে জীবনযাত্রা নিতান্ত সাদাসিধা, বৈষয়িকতা, বিলাসিতা মনকে টানাছেঁড়া করিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষাটা একেবারে স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাইবার সময় ও সুবিধা পায়।'

টোল সংস্কারের নামে টোলের ঐতিহ্য ও পরম্পরার বিলুপ্তি ঘটাতে আগ্রহী এই সরকার। টোলশিক্ষা প্রতিষ্ঠানিক রূপ পেলে তা আর টোল থাকে না বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বস্তুত পাশ্চাত্যদেশে যখন সংস্কৃত যোগ, বাস্তুশাস্ত্র, বৈদিকগণিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তখন আমাদের দেশে পরম্পরাগত এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙার প্রচেষ্টা চলছে।

বাংলাদেশের টোলগুলিতে একসময় ন্যায় পড়ানো হোত। পাদরি এ. ওয়ার্ড তাঁর 'Account of the writings, religion and manners of the Hindoos' শীর্ষক বইটির দ্বিতীয় খণ্ডে বলেছেন, 'Almost every town in Bengal contains some Nyayayikaa Schools, though they are most numerous at Nuddeya, Triveni and Vasveriya.' কিন্তু ন্যায় ছাড়াও টোলগুলিতে কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতি বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি বিষয়গুলি পড়ানো হোত। সে সময় শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক আলোচনা ও তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতেন। টোলের শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার পর অধ্যাপকবৃন্দ ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতার জন্য নানা রকম উপাধিতে ভূষিত করতেন। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের বিদ্বৎসমাজে এ উপাধির মূল্য ছিল অপরিসীম।

সে সময় রাজা মহারাজারা সংস্কৃত শিক্ষার সংরক্ষণের জন্য অর্থ সাহায্য করতেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা নবদ্বীপের প্রতিটি টোলকে

১০০ টাকা করে বৃত্তি দিতেন। নবদ্বীপের ইতিহাস থেকে জানা যায় ১৮৮৭ সালের ১৮ মে রাজস্ব সমিতি জেলা কালেক্টরকে রাজকোষ থেকে ছাত্রদের মাসিক ১০০ টাকা করে সাহায্য দানের নির্দেশ দেন। ১৮২৯ সালে ওই ব্যবস্থা বাতিল করা হলেও উইলসনের উদ্যোগে ১৮৩০ সালে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। ১৮৮৪ সালে রেভিনিউ কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় নদীয়ার রাজাও টোলগুলিকে আর্থিক সাহায্য করতেন। পরবর্তীকালে সরকারি সাহায্যও পাওয়া যেতে থাকে। কলকাতা পুরসভার 'List of applications received from primary, industrial, oriental and right schools for the corporation grants in aid for the year 1935-36' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ওই সালে কলকাতা পুরসভা কলকাতার পাঁচটি ওয়ার্ডের ৬৩ টি টোলকে ৬৯৪৬ টাকা সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪০-৪১ সালে কলকাতার ৩২টি ওয়ার্ডের ১৭২টি টোলকে কলকাতা পুরসভা সাহায্য করেছিলেন মোট ১৫,৯৩১ টাকা।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন এই টোলশিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি আরও উন্নয়নমুখী করতে সচেষ্ট হন। মহেশচন্দ্রের পিতৃব্য ঠাকুরদাস চূড়ামণি। হাতিবাগানে তাঁর টোল ছিল। মহেশচন্দ্র নিজে কলেজ শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ও গভীরতার অভাব লক্ষ্য করেই টোলের শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। মহেশচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন কলেজ শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষার উন্নতি হয় না। তাই তিনি চেয়েছিলেন টোলের শিক্ষা এক স্বতন্ত্র পথে চলুক। টোলে যেভাবে শিক্ষাদান করা হয়, শুধুমাত্র সংস্কৃত কলেজের মাধ্যমে সেই শিক্ষাদান প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনকালে এই টোল সমূহকে সাহায্য দেবার প্রস্তাব করে ১৮৭৮ সালের ১৫ আগস্ট শিক্ষা অধিকর্তা ক্রাফট্‌কে মহেশচন্দ্র পত্র লিখলেন— 'টোল বা প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষায়তন সমূহ সেকালে বহু সৎকার্য্য করিয়াছে। উহা সংস্কৃত বিদ্যার দীপশিখা এদেশে প্রোজ্জ্বল রাখিয়াছে। চতুষ্পাঠী শিক্ষার পদ্ধতি প্রাণশক্তিতে অটুট, আগামী বহুকাল এই ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকিবে।'

মহেশচন্দ্র ১৮৯১ সালে বাংলা বিহার ওড়িশার টোলগুলি পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহের পর তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা ক্রাফট সাহেবের কাছে এক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন ও কয়েকটি জরুরি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত নিয়মগুলি টোলশিক্ষার ক্ষেত্রে আজও অনুসৃত হয়ে আসছে। তাঁরই উদ্যোগে চতুষ্পাঠী উন্নয়নের জন্য ১৮৭২ সালে 'বেঙ্গল সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশন' গড়ে ওঠে। যাদের দায়িত্ব ছিল চতুষ্পাঠী শিক্ষার উন্নয়ন এবং প্রসারে উদ্যোগ নেওয়া। ১৯৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত এই অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গেই যুক্ত ছিল। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার টোলশিক্ষার আরও উন্নতির জন্য ১৯৪৯ সালের ৪ঠা মে 'বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ' গঠন করেন এবং এর একটি সংবিধান রচিত হয়। সরকার এর বিভিন্নধারা অনুমোদন করে এটির পরিচালন ব্যবস্থার জন্য নির্বাচিত কমিটি, সচিব এবং ২ জন টোল পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের অধীন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই যে পরিমাণ টোল ছিল সেই শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই এই সংখ্যা কমতে শুরু করে। ২০০৩-০৪ বছরে পশ্চিমবঙ্গের ১৭টি জেলায় চলেছিল চারটি সরকারি, দুটি সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত সহ ৬৯৮টি বেসরকারি সংস্কৃত টোল। প্রায় এক হাজার পণ্ডিত ও ১২০ জন অশিক্ষক কর্মচারী এই টোল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত। বেসরকারি টোলের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি মেদিনীপুরে। শুধুমাত্র কাঁথিতেই রয়েছে ২৩২ টি টোল। ২২টি মেদিনীপুর সদরে, ১৭টি তমলুকে, ঘাটাল ও হলদিয়ায় ৭টি এবং ঝাড়গ্রামে ২টি। পণ্ডিতের সংখ্যা ৩৫২ জন। এরপর রয়েছে হুগলি। আরামবাগে রয়েছে ৫৩টি টোল। চন্দননগরে ৪টি, হুগলিতে ১০টি ও শ্রীরামপুরে ৯টি। পণ্ডিতের সংখ্যা ৯৬ জন। কলকাতাতে রয়েছে ৫০টি টোল এবং ৭০ জন পণ্ডিত। বাঁকুড়া জেলাতে ২৬টি টোলে ৩০ জন পণ্ডিত কাজ করছেন। উত্তর ২৪ পরগণায় ২৫টি টোলে ৩৯ জন পণ্ডিত রয়েছেন। জলপাইগুড়ির আলিপুরদুয়ারে একটি টোলে একজন পণ্ডিত যুক্ত রয়েছেন। বর্ধমানে টোলের সংখ্যা ৬৫ এবং পণ্ডিতের সংখ্যা ৯৪ জন। হাওড়া জেলায় ১৪টি টোলে ২০ জন পণ্ডিত এবং মালদহ, দার্জিলিং, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় একটি করে টোল এবং একজন করে পণ্ডিত। কোচবিহারে দুটি টোলে তিনজন পণ্ডিত, নদীয়াতে ২৩টি টোলে ২৯ জন পণ্ডিত এবং মুর্শিদাবাদ ও পুরুলিয়ায় দুটি করে টোলে দুজন করে পণ্ডিত রয়েছেন। বীরভূমে ৩৩ টি টোলে ৪৪ জন পণ্ডিত এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ২২টি টোলে ২৬ জন পণ্ডিত পঠনপাঠনের কাজ করে চলেছেন।

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে ১৯৯১ সালে রাজ্যে টোলের সংখ্যা ছিল ৯০৭। ১৯৯৫ সালে তা কমে

রাজ্যে ঊর্দু শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। অপরদিকে রাজ্যের উদাসীনতায় কোচবিহারের সরকারি সংস্কৃত কলেজ এবং নবদ্বীপের সরকারি কলেজটি বন্ধ হয়ে গেছে। মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি উন্নয়ন হলেও টোল শিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতিটুকুও দিতে রাজি নয় এই সরকার।

হয়েছে ৭৭৮ টিতে। ২০০৪ সালে ৬৯৮টি এবং ২০০৬ সালে তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৬২০টিতে। ২০১০ সালে এই সংখ্যা ছিল ৬০০টি।

স্কুল থেকে সংস্কৃত তুলে দেশের ফলে টোলের সংকট ঘনীভূত হয়েছে। সরকারি দৃষ্টিতে চতুষ্পাঠীগুলি আজ হয়ে উঠেছে বাড়তি বোঝা। সংবিধান অনুসারে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ টোল পণ্ডিতদের দ্বারা নির্বাচিত একটি স্বশাসিত পর্ষদ হিসেবে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে কুক্ষিগত করার জন্য বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের নির্বাচিত কমিটিকে ভেঙে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। শুরু হয় টোল শিক্ষার অধঃপতন। ১৯৮১ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপরও টোলে পরীক্ষা অনিয়মিত। সরকার সাহায্য না করায় গত তিন বছর পরীক্ষা হয়নি। সমাবর্তন উৎসব হয় না। এমনকী টোলের পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বেসরকারি ব্যক্তি বা ট্রাস্টের দেওয়া গচ্ছিত অর্থের কোনও হদিশ নেই। ত্রিশ বছর কোনও নতুন অধ্যাপক তো দূরের কথা শূন্যপদগুলিতেও নিয়োগ বন্ধ করে টোলের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিশনকে দিয়ে সম্প্রতি টোলের পণ্ডিত-অধ্যাপকদের অবসর গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিয়েছেন এই সরকার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, টোলের পণ্ডিতদের কোনও বেতন নেই। আজীবন তাঁরা একটি সামান্য মহার্ঘ্যভাতা পান। ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী কমিশন, ডঃ ভবতোষ দত্ত কমিশন, ডঃ অশোক মিত্র কমিশন এই মহার্ঘ্যভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু অবসর গ্রহণের কথা বলেননি। আবার ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিশন টোলের পণ্ডিতদের অবসর গ্রহণ বাধ্যতামূলক করলেও মহার্ঘ্যভাতা বৃদ্ধি, অবসরের পর পেনশন বা অন্য কোনও সাহায্যের ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন।

টোল পড়ুয়ারা কর্মক্ষেত্রে কোনও বিশেষ সুবিধা পান না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ দপ্তরে নাম তুলতে গেলেও টোল-উত্তীর্ণ ছাত্রদের সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হয় না। এমনকী স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগের সময় টোল শিক্ষার জন্য বাড়তি কোনও ক্রেডিট ধরা হয় না। অথচ ১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত ভারত সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, কলকাতার বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের 'তীর্থ' উপাধি যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ডিগ্রির সমতুল্য। টোলে উত্তীর্ণ ছাত্রদের চাকরি তো দূরস্থান, গবেষণারও কোনও সুযোগ নেই। পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র বাজারে চলে যায়। অভিযোগ, উত্তর কলকাতার হেঁদোরপাড়ে গোপনে লেনদেন হয় পৌরোহিত্য সহ সমস্ত প্রশ্ন। তাই টোলে পড়াশোনা করে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কী? উত্তর— দেশের কোনও দায় নেই দায়িত্বও নেই। মাদ্রাসায় আরবী শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও টোলে পৌরোহিত্য ও জ্যোতিষ শিক্ষায় সরকারের আপত্তি রয়েছে। এজন্য সরকারি নির্দেশে কয়েকবছর পূর্বে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের তৎকালীন সচিব গৌরকিশোর ভাদুড়ি কয়েকজন সংস্কৃত শিক্ষাবিদকে নিয়ে টোলের জন্য একটি নতুন সিলেবাস তৈরি করে টোলে টোলে বিলি করেছিলেন, সেখানে পৌরোহিত্য এবং জ্যোতিষ বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছিল। অথচ বিগত বছরগুলিতে সবচেয়ে বেশি ছাত্র পরীক্ষা দিয়েছে পৌরোহিত্য বিষয়ে। আজকের সমাজের অর্থকরী উপযোগী বিষয় হচ্ছে পৌরোহিত্য এবং জ্যোতিষ। ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কমিটি আবার টোল সংস্কারের নামে টোলে ইংরেজি ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক পড়াবার সুপারিশ করেছেন। তবে টোলে ইংরেজি পড়ানোর সুপারিশ আজকের নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। ১৮৫০ ও ১৮৫২ সালে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষাধারার সনাতন রূপটি বদলে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন বহু বিদ্বজ্জনের প্রচেষ্টায় তা আর সম্ভব হয়নি। বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টায় বহু শিক্ষিত মানুষ অসন্তুষ্ট ছিলেন।

১৮৩০ সালের ২৭ মার্চ 'সমাচার দর্পণ' জোরালো প্রতিবাদ জানায় এর বিরুদ্ধে। সেখানে বলা হয়—'এতে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটবে অথচ ইংরেজি শিক্ষালাভও সম্পূর্ণ হবে না।' টোল সংস্কারের নামে টোলের ঐতিহ্য ও পরম্পরার বিলুপ্তি ঘটাতে আগ্রহী এই সরকার। টোলশিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেলে তা আর টোল থাকে না বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বস্তুত পাশ্চাত্যদেশে যখন সংস্কৃত যোগ, বাস্তুশাস্ত্র, বৈদিকগণিত প্রভৃতি শিক্ষার জন্য ঘরে ঘরে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তখন আমাদের দেশে পরম্পরাগত এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙার প্রচেষ্টা চলছে। সরকারি এই অপচেষ্টাকে কার্যকরী করে তুলতে হাত মিলিয়েছেন একশ্রেণীর সংস্কৃত পণ্ডিত যা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। বস্তুত আজকের অবিভাবকেরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের যখন বাংলামাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠাতেই অনীহা বোধ করেন তখন ইংরেজি কিংবা অঙ্কের আকর্ষণে টোলে পড়তে পাঠাবেন এমন চিন্তা হাস্যকর।

১৯৭৭ সাল থেকে টোলের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড যেখানে এখন মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড-এর সমতুল সেখানে বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ গুরুত্বহীন একটি সংস্থা। ২০০৯-১০ আর্থিক বছরে মাদ্রাসা শিক্ষাখাতে যেখানে বাজেটের পরিমাণ ৫৭৫ কোটি টাকা যেখানে টোলের জন্য মাত্র ৬ কোটি। রাজ্যে উর্দু শিক্ষার উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। অপরদিকে রাজ্যের উদাসীনতায় কোচবিহারের সরকারি সংস্কৃত কলেজ এবং নবদ্বীপের সরকারি কলেজটি বন্ধ হয়ে গেছে। মাদ্রাসার জন্য রাশি রাশি উন্নয়ন হলেও টোল শিক্ষার সামাজিক স্বীকৃতিটুকুও দিতে রাজি নয় এই সরকার।

সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির।

পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতভারতী

প্রণব নন্দ

সংস্কৃত ভারতের আত্মা। সুপ্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিচার, চিন্তন, জীবনধারা সবকিছুই সংস্কৃতের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। সংস্কৃতই বিশ্বের প্রথম ভাষা। বেদ, দর্শন, উপনিষদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রের উদ্‌গমস্থল সংস্কৃত। সকল ভারতীয় ভাষাই সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত এবং সংস্কৃত দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত যা আমরা সকলেই জানি। কোটি কোটি শব্দ নির্মাণের অদ্ভুত ক্ষমতা সংস্কৃতেই আছে। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা ভারতীয় অস্মিতা রক্ষার জন্য চাই সংস্কৃত। সংস্কৃতেই রয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণভোমরা। সংস্কৃত থেকে সরে গেলে ভারত হবে 'ইন্ডিয়া' অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিকৃত ভারত আর সংস্কৃত যুক্ত হলে ভারত হবে যথার্থ ভারতবর্ষ। কালের বিবর্তনে এই ভাষাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ফলে বিশ্বের দরবারে আমরা হারিয়েছি আমাদের মর্যাদা।

স্বামীজীর কথায়—"ভারতে 'সংস্কৃত ভাষা' ও 'মর্যাদা' সমার্থক। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান লাভ হইলে, কেহই তোমার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। ইহাই একমাত্র রহস্য...। এই পথ অবলম্বন কর।" (বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, ৫ম খণ্ড ১৯৬ পৃষ্ঠা) স্বামীজীর নির্দেশিত-সংস্কৃত ভাষা কে পুনর্জাগরণের তথা ভাষা আন্দোলন হিসাবে চালু করার জন্য চাই শক্তিশালী সংগঠন তথা আন্দোলন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই প্রতিষ্ঠা হয়েছে সংস্কৃত ভারতীর।

সংস্কৃতভারতী

সংস্কৃত ভাষায় প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রয়াসরত এক অখিল ভারতীয় সংগঠন সংস্কৃতভারতী। ১৯৮১ সালের জুন মাসে ২/৩ জনের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত সম্ভাষণ আন্দোলন কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরুতে 'হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠান' নামে আরম্ভ হয়। যা পরিবর্তিত হয়ে নাম হয় সংস্কৃত ভারতী। যার মুখ্য ছিলেন চ মু কৃষ্ণশাস্ত্রী, জনার্দন হেগড়ে ও ডঃ বিশ্বাস। যাঁরা আজও সংস্কৃত কার্যে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের জীবনকে সমর্পিত করেছেন।

সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সামাজিক সমরসতার দ্বারা এই রাষ্ট্রকে পরম বৈভবশালী করাই 'সংস্কৃতভারতী'র উদ্দেশ্য। জন্মলগ্ন থেকে মাত্র ৩০ বছরের মধ্যেই দেশের সমস্ত প্রান্তে সংস্কৃতভারতীর কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে প্রচার ও প্রসার লাভ করে চলেছে। কেবল ভারতেই নয় বর্তমানে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি প্রায় ১৮টি দেশেও দ্রুত গতিতে কার্য বিস্তার করছে সংস্কৃত ভারতী।

আমাদের বাংলায়ও মাত্র কয়েক বছরেই খুব উৎসাহের সাথে 'সংস্কৃতভারতী'র কাজ শুরু হয়েছে। ফলে বাঙালী সংস্কৃত ভাষীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভাষা এবং সংস্কৃতি পরস্পরের পরিপূরক। যদি কোনও জাতি তার ভাষা ভুলে যায় তাহলে ভাষা সম্বন্ধিত সংস্কৃতিও সাথে সাথে দূরে সরে যায়। তাই সংস্কৃত ভাষাকে পুনর্জাগরণের জন্য আমাদের

প্রাথমিক কাজ সংস্কৃত ভাষাকে আয়ত্ত করা। এই অভিনব পদ্ধতির মাধ্যমে মাত্র কুড়ি ঘণ্টার পাঠ্যক্রম রচনা করেছে সংস্কৃতভারতী। যার নাম সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির।

সম্ভাষণ শিবির

অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে নিত্য জীবনে আমরা যে সকল কথা প্রাত্যহিক ব্যবহার করি সেগুলিকে সরল সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শেখানো হয়। প্রতিদিন দুই ঘণ্টা করে টানা দশদিন এই শিবির চলে। উদ্যোগী যে কেউ কুড়ি পঁচিশজনকে একত্রিত করে নিঃশুল্ক এই শিবিরের আয়োজন করতে পারেন। বয়সের কোনও সীমা বা শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে না। পুরুষ-মহিলা, ছাত্র শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষিত-অশিক্ষিত যে কেউই আগ্রহী এই নিঃশুল্ক শিবিরে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাই সম্ভাষণ শিবিরে অংশগ্রহণকারীগণ সহজেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে সমর্থ হন।

সংস্কৃত ভারতী সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষাকে এক অপূর্ব নূতন শিক্ষণ পদ্ধতি, সমাজের সামনে তুলে ধরেছে। তাই সংস্কৃত অত্যন্ত কার্বন এই ভাবনাকে দূরে সরিয়ে আগ্রহী সাধারণ মনুষ্য অধিক সংখ্যায় সম্ভাষণ শিবিরে যোগদানের জন্য সংস্কৃত ভারতীর কার্যালয়ে সম্পর্ক করে স্থানীয় ভাবে শিবিরের আয়োজন করে চলেছেন যা সত্যই কল্পনাতীত।

আনন্দের কথা, আমাদের বাংলায় গত তিন বছরেই দ্বিশতাধিক সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজার সংস্কৃতপ্রেমী যোগদান করে সহজেই সংস্কৃতভাষী হয়ে উঠেছেন এবং প্রাত্যহিক জীবনে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করছেন।

খড়্গপুর আই. আই. টি. ছাড়াও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, আদ্যাপীঠ, শ্রী অরবিন্দ ভবন, পরমার্থ সাধক সঙ্ঘ ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানেও তাঁদের সহযোগিতায় সম্ভাষণ শিবির একাধিক বার হওয়ায় অধিক সংখ্যায় শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

সাপ্তাহিক মিলন

সম্ভাষণ শিবিরের পর নিয়মিত ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হলে চাই চর্চা ও অভ্যাস। নিজেদের সুবিধা অনুসারে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়ে শুরু হয় সংস্কৃতের ব্যাকরণগত বহুবিধ চর্চা। সপ্তাহে একদিন কমপক্ষে দুই ঘণ্টা হলেই আমরা সাপ্তাহিক মিলন কেন্দ্র বলতে পারি। যেখানে কেবল সংস্কৃত ছাত্র শিক্ষকরা শুধু নয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের সংস্কৃতপ্রেমীরাও উপস্থিত থাকেন। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই সম্পূর্ণ হয় বিধিধ চর্চা।

অত্যন্ত আনন্দের কথা বাংলায় সুদূর কুচবিহার থেকে নন্দীগ্রাম পর্যন্ত কলকাতা তথা বিভিন্ন জেলায় নিয়মিত সাপ্তাহিক মিলন কেন্দ্র অনেকগুলি চলছে। সেখানে তৈরি হয়েছে উৎসাহের বাতাবরণ।

আবাসীয় শিক্ষণবর্গ

সংস্কৃত ভাষা চর্চা অভ্যাসের পর সম্ভাষণ শিবির সঞ্চালনের দক্ষতা অর্জন তথা বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে পাঠদানের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে সংস্কৃতময় পরিবেশে থেকে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দশদিন এই শিক্ষণবর্গ হয়। যা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"এমন একটি মহান ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে, অন্য সমুদয় ভাষা যাহার সন্ততি স্বরূপ। সংস্কৃতই সেই ভাষা। ইহাই (ভাষা সমস্যার) একমাত্র সমাধান।" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, ৫ম খণ্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

শিক্ষণ বর্গে প্রবেশ থেকেই শুরু হয় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন। প্রাতঃকালে জাগরণ থেকে রাত্রিতে শয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সংস্কৃত ভাষা আরও ভালোভাবে শেখানোর অভিনব ব্যবস্থা থাকে।

২০০৮-এর আগস্টে বাংলায় সর্বপ্রথম দশদিনের আবাসীয় শিক্ষণ বর্গ হয় হালিশহরে স্বামী নিগমানন্দ মঠ ও আশ্রমে। মঠের প্রমুখ পূজ্য স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজের আশীর্বাদে গত তিন বছরে তিন বার আশ্রমে আবাসীয় শিক্ষণ বর্গ সুব্যবস্থিত হওয়ায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ সকলেই হয়েছেন আনন্দিত ও উৎসাহিত। প্রায় ত্রিশতাধিক শিক্ষার্থী যাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ। এর ফলে তাঁরা বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে সংস্কৃত ভাষায় মাধ্যমে পাঠদান করে চলেছেন। যাঁরা ইতিপূর্বে বাংলা বা অন্য ভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের পড়াতেন। এরজন্য তাঁরা সংস্কৃত ভারতীর কাছে কৃতজ্ঞ বলে দাবি করেন। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আমাদের বাংলায় আজ বিদ্যমান।

পুস্তক প্রকাশন

সমাজের সর্বস্তরের সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্য সহজ ও বোধগম্য বিবিধ পুস্তকের প্রকাশ করেছে সংস্কৃতভারতী। ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান, গান, গল্প এবং সংস্কৃতে বিজ্ঞানের বিষয় ছাড়াও সংস্কৃত ভাষা শেখার আকর্ষণীয় ডি ভি ডি-র মাধ্যমে সহজেই সংস্কৃতে জ্ঞানলাভ করা যায়।

আনন্দের কথা 'সরস্বতী সেবা যোজনা'র মাধ্যমে আরও সহস্রাধিক প্রকারের পুস্তক প্রকাশ করতে চলেছে সংস্কৃত ভারতী যা আগামীদিনে সংস্কৃতক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাড়া জাগাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

এছাড়াও নিয়মিত গল্প, বিজ্ঞান, হাস্যকৌতুক ও আধুনিক বার্তা জানবার সরল ও সকলের বোঝার যোগ্য শৈলীতে তৈরি বর্ণময় রঙিন মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা 'সম্ভাষণ সন্দেশ' যার লক্ষাধিক গ্রাহক বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছেন। আমাদের বাংলায় সহস্রাধিক অনুরাগী এই পত্রিকার গ্রাহক হয়ে নিজেদেরকে বিকশিত করে চলেছেন।

আবার যাঁরা কর্মব্যস্ত থাকেন বাড়ীতেই ডাকযোগে সংস্কৃত শিক্ষার এক অভিনব পদ্ধতির ব্যবস্থা করেছে সংস্কৃত ভারতী। হিন্দী ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণ দুই বছরের পাঠ্যক্রম। প্রতি ছয়মাসে বাড়ীতে বসেই পরীক্ষার মাধ্যমে সফল হলেই ডাকযোগে পাবেন প্রমাণপত্র (Certificate)।

এ ধরনের শিক্ষার্থী বঙ্গপ্রান্তে অনেকেই আছেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ও ডাকযোগে সংস্কৃত শিক্ষার পাঠ্যক্রম মুদ্রণের প্রয়াস চলছে।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী

বিজ্ঞান জগতে আজ যা কিছু বিদ্যমান তার সমস্তই সংস্কৃতেরই অবদান। Science in Sanskrit, Pride of India ও বহুবিধ পুস্তকের মাধ্যমে বিশদ তথ্য সহ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া সংস্কৃতে আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়েও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে যা জানলে পরে ভারতীয় শাস্ত্রের প্রতি আত্মগৌরব বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রভক্তি ও সংস্কৃতির বন্ধনে সুদৃঢ় হয়। বাংলার কলকাতাসহ বিভিন্ন জেলায় বহুবিধ কার্যক্রমে আমরা এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছি। বিজ্ঞান মনস্ক ব্যক্তিগণ যা দেখে আরও তথ্যমূলক পুস্তক বা চিত্র নেওয়ার জন্য আমাদের সাথে সম্পর্ক করছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি তথা সংস্কৃত জাগরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রমে এই ধরনের বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করার জন্য সংস্কৃত অনুরাগীদের জানাই সাদর আহ্বান।

সংস্কৃত সম্মেলন

সংস্কৃত বর্তমানে জন আন্দোলনের বিষয় যা সমগ্র দেশে তথা বাংলায় সংস্কৃত ভারতী আয়োজিত সভা ও সম্মেলনে— সংস্কৃতপ্রেমীদের উপস্থিতিই তার প্রমাণ দেয়। ১৯৯৪ সালে দিল্লীর

সংস্কৃতভারতীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক পথিক গুহ, বসে প্রণব নন্দ ও বন্ধুগৌরব ব্রহ্মাচারী।

তালকোটরা ময়দানের সংস্কৃত সম্মেলনে পঁয়ত্রিশ হাজারের অধিক সংস্কৃত অনুরাগী সমবেত হয়েছিলেন। যারা একসময় সংস্কৃতকে মৃত ভাষা (Dead language) বলে নাক কুঁচকোতেন আজ তাদের কপালে দেখা দিচ্ছে ভাঁজের রেখা।

বিভিন্ন সংস্কৃত সম্মেলনে সমাজের এমন কয়েকজন বিশিষ্ট জনকে আমরা পেয়েছি যাঁরা সংস্কৃত জগতের ব্যক্তিত্ব না হয়েও বাংলায় সর্বদা সংস্কৃত কার্যে উৎসাহিত করে চলেছেন।

কলকাতা, বাঁকুড়া, হালিশহর, হাওড়াসহ বাংলার বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত সম্মেলনে অধিক সংখ্যায় উপস্থিতি মনে করিয়ে দেয় বাঙালিদের সংস্কৃত প্রীতি। কোথাও সুদৃশ্য শোভাযাত্রা কোথাও বা সাইকেল-র‍্যালীর মাধ্যমে সংস্কৃতের পুনঃপ্রচার বাংলায় এনেছে নবজাগরণ। বর্তমানে সংস্কৃত কেবল টোল বা চতুষ্পাঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় সংস্কৃত এখন সবার সংস্কৃত সকলের সংস্কৃত সর্বত্র।

উপলব্ধি

সংস্কৃত ভারতী গত কয়েক বছরে সমগ্র দেশে তথা বাঙালীর কি করতে পেরেছে তা অবলোকন করলে আমাদের উৎসাহ ও বিশ্বাস অধিক গুণ বৃদ্ধি পাবে। যদিও সংগঠন দৃষ্টিতে তা নিতান্তই শিশু।

আজ পর্যন্ত সমগ্র দেশে লক্ষাধিক সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে কোটি সংখ্যারও বেশী শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সংস্কৃত ভাষার কথা বলার প্রয়াস করে চলেছেন। যাঁদের মধ্যে আছেন সংসদ সদস্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার, মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা প্রশাসনিক ও সামাজিক জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ফলে গীতা প্রেসের গীতা পুস্তকের মতো সমস্ত ভাষায় মুদ্রিত 'সংস্কৃতং বদতু' ও 'সংস্কৃত ব্যবহার সাহস্রী' ইত্যাদি পুস্তক লক্ষ লক্ষ বিক্রয় হচ্ছে। বাংলা ভাষায় এই পুস্তকগুলির বিপুল চাহিদা। দিল্লীতে শুরু হয়েছে সংবাদশালা যেখানে সর্বদা সংস্কৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করা যায়। মাঝে দুইটি চক্র— প্রতি চক্র চৌদ্দ দিনের। দেশ বিদেশের বহু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে সংস্কৃতভাষী হয়ে উঠেছেন।

সংস্কৃতভারতীর প্রচেষ্টায় কয়েকটি গ্রাম সংস্কৃত গ্রামে পরিণত হয়েছে যা বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে। গ্রামের আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন চলেছেন। আরও কয়েকটি গ্রামকে সংস্কৃত গ্রামে পরিণত করার প্রয়াস চলছে।

সমর্পিত পূর্ণকালীন কার্যকর্তাদের নির্মাণ। যার ফলে বর্তমান দ্বিশতাধিক পূর্ণকালিক, বিস্তারক সম্পূর্ণ ভাবে সংস্কৃত কার্যে জীবন সমর্পণ করেছেন। সাথে কাজ করে চলেছেন কয়েক হাজার সংস্কৃত কার্যকর্তা। তাঁরা পরিবারকে করেছেন সংস্কৃত পরিবার এবং গৃহকে করেছেন সংস্কৃতগৃহম।

অভূতপূর্ব উপলব্ধি, জানুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোরে হওয়া 'বিশ্ব-সংস্কৃত-পুস্তকমেলা'। সংস্কৃত ইতিহাসে যা ছিল ঐতিহাসিক, অবর্ণনীয়। বাংলার শতাধিক প্রতিনিধি এই মেলা দর্শন করে হয়েছেন ধন্য। মাত্র ৩ দিনেই বিক্রয় হয়েছে চার কোটির টাকার সংস্কৃত বই। সংস্কৃত জগতের ব্যপ্তি ও গভীরতা দর্শনের জন্যই হয়েছিল এই মেলা। যা একশ' শতাংশই সফল। আগামী শতাব্দী সংস্কৃত শতাব্দী এই লক্ষ্য নিয়ে আমাদের চলতে হবে। সংস্কৃতপ্রেমী বন্ধুগণের কাছে অনুরোধ, আসুন সংস্কৃত ভারতীর কাজে যুক্ত হয়ে সংস্কৃতকার্যে সময় সমর্পণ করে নিজের জন্মকে সার্থক করে তুলি। জয় আমাদের হবেই। জয়তু সংস্কৃতম্, জয়তু ভারতম্।

(লেখক সংস্কৃত ভারতীর প্রান্ত সংগঠন মন্ত্রী)

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সংস্কৃত ভারতী

২৬, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০০০৬, দূরবাণী-৯৪৭৪৫৬৪০২২

সংস্কৃত ভাষার প্রচার-প্রসারে বিদ্বৎজনের অভিমত

আজ থেকে তিরিশ বছর (১৯৮০) আগে ভারতীয় সংস্কৃত সংগ্রাম সমিতির সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক নবকুমার ভট্টাচার্য আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির কাছে সংস্কৃত ভাষার প্রচার প্রসারে তাঁদের অভিমত জানতে চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাঁদের সেই প্রত্যুত্তরগুলি এখানে প্রকাশ করা হলো।

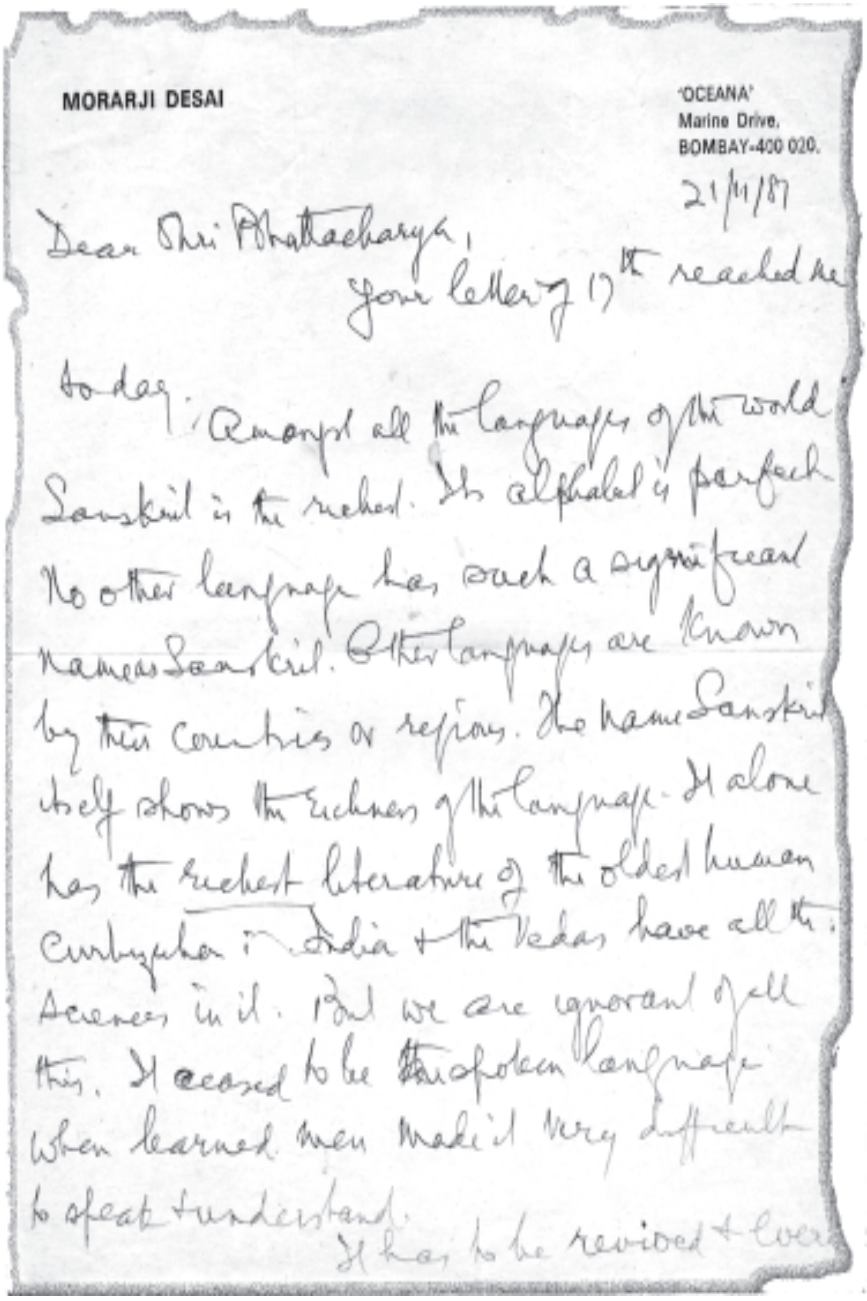

—সঃ স্বঃ

MORARJI DESAI

'OCEANA'
Marine Drive,
BOMBAY-400 020.

21/11/81

Dear Shri Bhattacharya,

Your letter of 17th reached me today.

Amongst all the languages of the world Sanskrit is the richest. Its alphabet is perfect. No other language has such a significant name as Sanskrit. Other languages are known by their countries or regions. The name Sanskrit itself shows the richness of the language. It alone has the richest literature of the oldest human civilization in India + the Vedas have all the sciences in it. But we are ignorant of all this. It ceased to be the spoken language when learned men made it very difficult to speak + understand.

It has to be revived + ever

মোরারজী দেশাই

২১.১১.৮১

প্রিয় শ্রীভট্টাচার্য,

আপনার ১৭ তারিখের পত্র আজ পাইলাম।

জগতের সকল ভাষার মধ্যে সংস্কৃত সবচেয়ে সমৃদ্ধ। এর অক্ষরমালা পূর্ণ (নিখুঁত)। অন্য কোনও ভাষাতেই সংস্কৃতের মতো সার্থক নাম নাই। অন্যান্য দেশ বা অঞ্চলে অন্য ভাষা প্রচলিত আছে। 'সংস্কৃত' নাম এই ভাষার সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। মানুষের প্রাচীনতম সভ্যতার সাহিত্য এতে রয়েছে, অর্থাৎ ভারত এবং বেদের সমস্ত বিজ্ঞান এর মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যখন পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এ ভাষা বলা ও বোঝা খুব কঠিন করেছেন, তখন থেকে এ ভাষা আর কথ্য ভাষা থাকল না।

এ ভাষা পুনর্জীবিত করা উচিত এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর তা শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু তা জোর করে করা যাবে না, অর্থাৎ আইনের দ্বারা হ'বে না। এ কাজ বুঝিয়ে করতে হ'বে, আর সরল সংস্কৃত ভাষা প্রচার করে তা করতে হবে। গীতার মতো পুস্তক আর নাই; আর যদি তা' জনপ্রিয় করা যায়, তবে তারা সংস্কৃতকে আরও ভালোভাবে গ্রহণ করবে।

আপনি এই প্রচার কার্য করছেন জেনে আমি আনন্দিত, আর আপনার পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি।

ইতি—

আপনার আন্তরিক

মোরারজী দেশাই

सेक्रेटरी
आचार्य विनोबा भावे

तार-फोन 2518 वर्धा
आश्रम, पवनार 442111

21.11.80

श्री. भट्टाचार्यजी,

आपका 12.9.80 का पत्र विनोबाजी को मिला है। आप जो प्रयत्न कर रहे हैं उसके लिए विनोबाजी की शुभकामना है।

विनोबाजी तो चाहते हैं कि भारत में हरेक को संस्कृत आनी चाहिए और स्कूल-कॉलेजों में वह compulsorily सिखानी चाहिए। भारतीय भाषाएं संस्कृत पर से बनी हैं। इसके अलावा अंग्रेजी के कुछ शब्द भी मूल संस्कृत धातु पर से बने हैं।

आप अपनी संस्था के द्वारा संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं, यह ठीक ही है। उसके साथ-साथ सभी भारतीय भ. के लिए संस्कृत लिपि का (देवनागरी लिपि का) उपयोग हों ऐसा भी प्रयत्न होना चाहिए। ताकि संस्कृत भारत की एकात्मता के लिए आवश्यक है इसका भान सबको ~~हों~~ होगा।

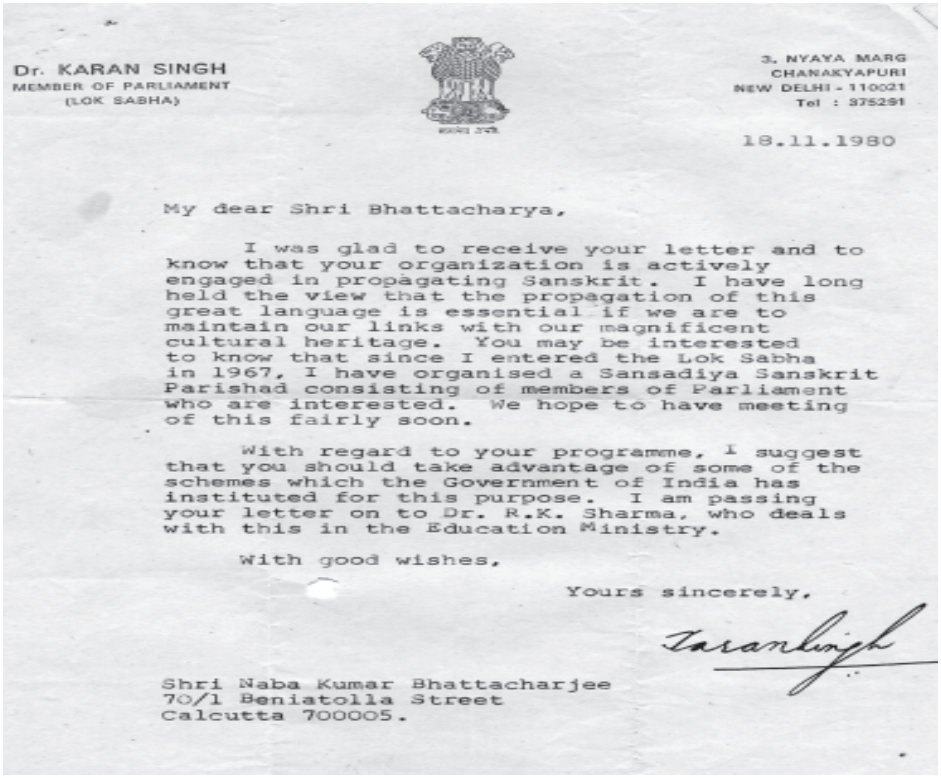

Dr. KARAN SINGH
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

3, NYAYA MARG
CHANAKYAPURI
NEW DELHI - 110021
Tel : 375291

18.11.1980

My dear Shri Bhattacharya,

I was glad to receive your letter and to know that your organization is actively engaged in propagating Sanskrit. I have long held the view that the propagation of this great language is essential if we are to maintain our links with our magnificent cultural heritage. You may be interested to know that since I entered the Lok Sabha in 1967, I have organised a Sansadiya Sanskrit Parishad consisting of members of Parliament who are interested. We hope to have meeting of this fairly soon.

With regard to your programme, I suggest that you should take advantage of some of the schemes which the Government of India has instituted for this purpose. I am passing your letter on to Dr. R.K. Sharma, who deals with this in the Education Ministry.

With good wishes,

Yours sincerely,

Karan Singh

Shri Naba Kumar Bhattacharjee
70/1 Beniatolla Street
Calcutta 700005.

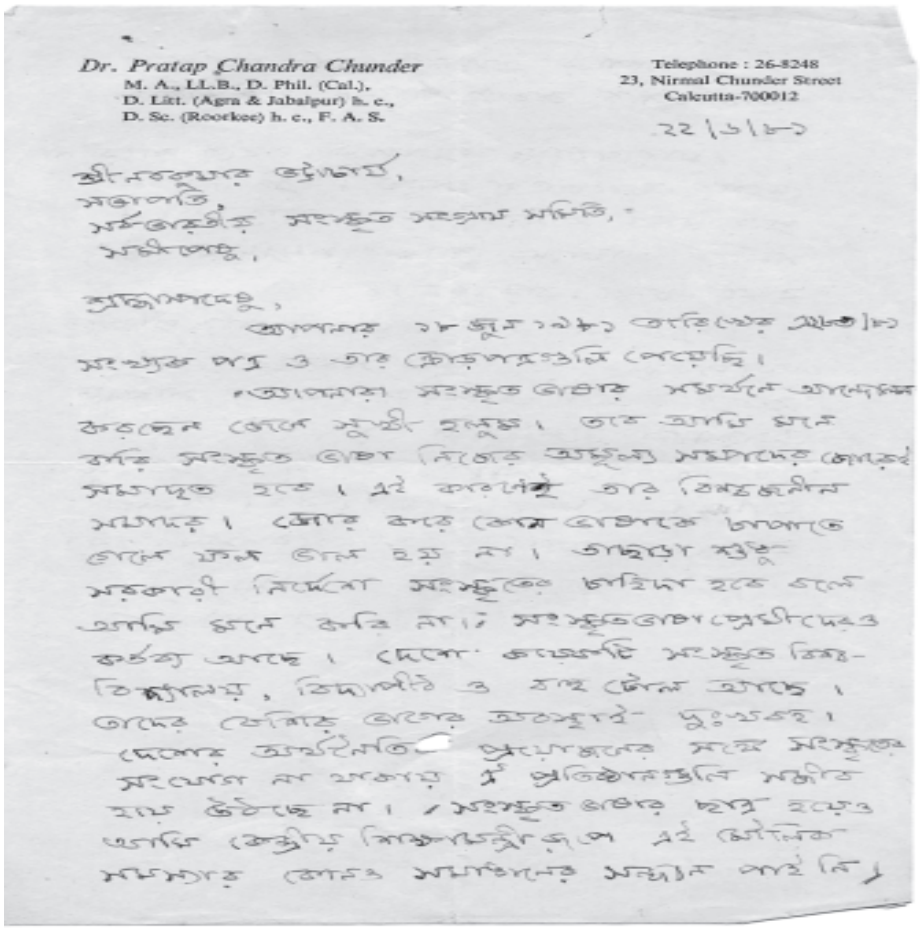

Dr. Pratap Chandra Chunder
M. A., LL.B., D. Phil. (Cal.),
D. Litt. (Agra & Jabalpur) h. c.,
D. Sc. (Roorkee) h. c., F. A. S.

Telephone : 26-8248
23, Nirmal Chunder Street
Calcutta-700012

22/3/8-

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের নিয়ম

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন (১৯৩৬) তা প্রধানত অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দুটি নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম বৈপ্লবিক। তা হচ্ছে 'রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন'।

তৎসম শব্দের বানান সংস্কৃত শব্দের বানানের অনুরূপ হবে। কারণ সংস্কৃত শব্দের বানানে নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সুসংহত গঠনরীতি রয়েছে। এই বানানের পরিবর্তন বা বিকৃতি অনুচিত। তৎসম শব্দ থেকেই তদ্ভব শব্দের উদ্ভব হয়েছে। যে পরিবর্তনের ধারায় বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে তৎসম শব্দের বানান পরিবর্তিত হলে সে পরিবর্তনের চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে।

সংস্কৃত বা তৎসম শব্দে স্বরবর্ণভেদের মধ্যে ই-কার ও ঈ-কার এবং উ-কার ও ঊ-কারের পার্থক্য প্রধান। আধুনিক বাংলায় আমাদের উচ্চারণে হ্রস্ব স্বরধ্বনি ও দীর্ঘ স্বরধ্বনির মধ্যে কোনও ভেদ নেই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের ভেদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদে অর্থাৎ ই/ঈ বা উ/ঊ ভেদে শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটত।

বাংলায় মৌলিক ও সাধিত উভয় প্রকার সংস্কৃত শব্দই ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয়-নিষ্পন্নই হোক অথবা সমাসবদ্ধ পদই হোক শব্দের সাধন এবং গঠনপ্রণালী শব্দের বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই শুদ্ধ বানানের জন্য শব্দ বা পদ গঠনের নিয়মাবলী জানা অপরিহার্য। শুদ্ধ ভাষার নিয়ম-কানুন এবং সূত্রাবলী ব্যাকরণে লিপিবদ্ধ থাকে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দের বানান এবং শব্দ ব্যবহারের সম্পূর্ণ ব্যাকরণ এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যে-ক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি সে-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মই বিবৃত হয়েছে। এই নিয়মগুলি পাঠ করে একজন ভাষার নিয়মকানুন সম্বন্ধে যেমন অবহিত হবেন, তেমনি বানান-বিভ্রমের হাত থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম নির্ধারণ করেছিলেন (১৯৩৬) তা প্রধানত অ-সংস্কৃত অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী ও বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে প্রদত্ত দুটি নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম বৈপ্লবিক। তা হচ্ছে 'রেফের পর ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব বর্জন'। যথা—'অর্চনা, মূর্ছা, অর্জুন, কর্তা, কার্তিক, বার্তা, কর্দম, অর্থ, বার্ধক্য, কর্ম, কার্য, সর্ব'। এই দ্বিত্ববর্জিত বানান বর্তমানে প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত। এমনকী আধুনিক বাংলা অভিযানে দ্বিত্বসহ প্রাচীন বানানও বর্জিত হয়েছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'রেফের পর দ্বিত্ব বিকল্পে সিদ্ধ', তাই এই পরিবর্তন ব্যাকরণ-বহির্ভূত নয়। কিন্তু 'সূর্য, শৌর্য, বীর্য ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত রেফের পর দ্বিত্বপ্রাপ্ত 'অন্তঃস্থ য-ফলা' বর্জনের সাদৃশ্যে কোন কোন শব্দের 'য-ফলা' বাদ দেওয়ার অযৌক্তিক প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানের যে-নিয়মাবলী এখানে উদ্ধৃত হল তার বিষয়গুলি হচ্ছে ঃ

ক. সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান, খ. সংস্কৃত শব্দে যত্ব-বিধান, গ. নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার, ঘ. বিসর্গের ব্যবহার, ঙ. স্বরসন্ধি, চ. ব্যঞ্জনসন্ধি, ছ. স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন, জ. বহুবচনজ্ঞাপক শব্দাবলী, ঝ. বিশেষ্য-

বিশেষণ পদগঠন।

সংস্কৃত শব্দে ণত্ব-বিধান

১। 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল 'ণ' যুক্ত হয়। যেমন—কণ্টক, ঘণ্টা, লুণ্ঠন, অবগুণ্ঠন, খণ্ড, ভাণ্ড, কাণ্ড ইত্যাদি। ষ্ক 'ত' বর্গীয় বর্ণের আগে কখনো 'ণ' যুক্ত হয় না, কেবল 'ন' হয়। যেমন—অন্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, বন্ধন ইত্যাদি। ৰ ২। 'ঋ, র, ষ'-এর পরে 'ণ' বসে। যেমন—ঋণ, তৃণ, ঘৃণা, বর্ণ, বিকীর্ণ, ভীষণ, বিষাণ, লক্ষণ ইত্যাদি। ৩। 'ঋ' 'র' 'ষ'-এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গীয় বর্ণ, প-বর্গীয় বর্ণ, 'য', 'অন্তঃস্থ ব', 'হ' অথবা অনুস্বার থাকলে 'ণ' হয়। যেমন—চরণ হরিণ, রেণু, সৃক্কণী, কৃপণ, অর্পণ, নির্বাণ, লক্ষ্মণ, প্রয়াণ, ম্রিয়মান, ব্রাহ্মণ, গ্রহণ, বৃংহণ ইত্যাদি।

সংস্কৃত শব্দে ষত্ব-বিধান

১। 'ঋ-কারের পর 'ষ' বসে। যেমন ঋষি, বৃষ, কৃষক, কৃষি, তৃষা ইত্যাদি। ষ্ক ব্যতিক্রম—কৃশ্ ধাতু থেকে জাত কৃশ, কৃশকায়, কৃশাঙ্গ, কৃশানু, কৃশোদর। ৰ ২। 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে কেবল 'ষ' যুক্ত হয়। যেমন—দুষ্ট, কষ্ট, সৃষ্ট, কাষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কনিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। ৩। 'অ' 'আ'-ভিন্ন স্বর এবং 'ক' 'র'-এর পর বিভক্তি-প্রত্যয়াদির 'স' থাকলে তা 'ষ'-তে রূপান্তরিত হয়। যেমন—কল্যাণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, আবিষ্কার, গোষ্পদ, চিকীর্ষা, জিগীষা ইত্যাদি। ৪। ই-কারান্ত ও উ-কারান্ত (অধি, অনু, অভি, নি, পরি, প্রতি, সু) উপসর্গের পর কতকগুলি ধাতুর 'স' রূপান্তরিত হয়ে 'ষ' হয়। যেমন—'অধি' উপসর্গ-যোগে—অধিষ্ঠান (অধি ꠲ স্থান), অধিষ্ঠাতা, অধিষ্ঠিত, অধিষ্ঠাত্রী। 'অনু' উপসর্গযোগে—অনুষঙ্গ (অনু ꠲ সঙ্গ)। 'অভি' উপসর্গযোগে—অভিষেক (অভি꠲ সেক), অভিসিক্ত। 'নি' অথবা 'নির্' উপসর্গযোগে—নিষ্কণ্টক (নিঃ নির ꠲ কণ্টক), নিষেধ। 'পরি' উপসর্গযোগে—পরিষ্কার (পরি ꠲ কার), পরিষ্কৃত। 'প্রতি' উপসর্গযোগে—প্রতিষেধ (প্রতি꠲ সেধ), প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠান। 'বি' উপসর্গযোগে—বিষণ্ণ (বি ꠲ সন্ন), বিষুব, বিষাদ। 'স' উপসর্গযোগে—সুষুপ্ত (সু ꠲ সুপ্ত) সুষমা সুষ্ঠু ইত্যাদি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনের ব্যবহার

১। নাসিক্য-যুক্ত ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বর্গীয় নাসিক্য ব্যঞ্জনই যুক্ত হবে। যেমন—'ক' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে নাসিক্য 'ঙ', 'চ' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ঞ', 'ট' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গের 'ণ', 'ত' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ন', 'প' বর্গীয় বর্ণের সঙ্গে 'ম'। উদাহরণ—অঙ্ক, শঙ্খ, গঙ্গা, চঞ্চ ল, অঞ্জন, ঝঞ্ঝা, কণ্টক, লুণ্ঠন, পাষণ্ড, রত্ন, গ্রন্থ, কুন্দ, অন্ধ, কম্পন, লম্ফ, সম্ভ্রান্ত, বিশ্ব, সম্মিলন ইত্যাদি।

২। সন্ধিসম্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত্য ব্যঞ্জন 'ম্' ও দ্বিতীয় শব্দের আদ্য ব্যঞ্জন 'ক, খ, গ, ঘ' হলে সন্ধিতে 'ম্'-এর স্থলে 'ঙ' অথবা 'ং' হয়। যেমন—অহম্ ꠲ কার—অহঙ্কার/অহংকার, সম্ ꠲ কট—সঙ্কট/সংকট, সম্ ꠲ গত—সঙ্গত/সংগত, সম্ ꠲ গীত সঙ্গীত/সংগীত, সম্ ꠲ ঘটন—সঙঘটন/সংঘটন, ভয়ম্ ꠲ কর—ভয়ঙ্কর/ভয়ংকর, শুভম্ ꠲ কর—শুভঙ্কর/শুভংকর, পারম্ ꠲ গম—পারঙ্গম/পারংগম, হৃদয়ম ꠲ গম—হৃদয়ঙ্গম / হৃদয়ংগম।

৩। সন্ধিসম্ভব শব্দদ্বয়ের মধ্যে প্রথম শব্দের অন্ত-ব্যঞ্জন 'ম্' এবং দ্বিতীয় শব্দের আদ্য-ব্যঞ্জন অন্তঃস্থ বা উষ্ম বর্ণ (য র ল ব শ ষ স হ) হলে সন্ধিতে 'ম' স্থানে 'ং' হয়, 'ঙ' হয় না। যেমন—সংযোগ (সম্꠲ যোগ) সংরক্ত (সম্꠲ রক্ত) সংলগ্ন (সম্꠲ লগ্ন) সংবাদ (সম্ ꠲ বাদ), সংশয় (সম্꠲ শয়), সংসর্গ (সম্ ꠲ সর্গ), সংহার (সম্꠲ হার) ইত্যাদি। ষ্ক প্রিয়ংবদা, সংবর্ধনা, সংবলিত, স্বয়ংবর প্রভৃতি শব্দের প্রিয়ম্বদা, সম্বর্ধনা, সম্বলিত, স্বয়ম্বর রূপ অশুদ্ধ। ৰ ৪। সুসংহত মৌল বা একক (বা একাক্ষরিক) শব্দে 'ঙ' স্থানে 'ং' হবে না। যেমন—অঙ্ক, গঙ্গা, সঙ্গ, লিঙ্গ, বঙ্গ, পঙ্ক, ভঙ্গ, রঙ্গ, বঙ্কিম, পঙ্কিল, রঙ্গন, পঙ্গপাল, পঙ্গু, ভঙ্গুর ইত্যাদি।

বিসর্গের ব্যবহার

১। পদান্তে সংস্কৃত শব্দে বিসর্গ অবিকৃত থাকে। যেমন—আয়ুঃ, সদ্যঃ, বক্ষঃ, মনঃ, ক্রমশঃ, ইতস্ততঃ, বিশেষতঃ ইত্যাদি। তবে বাংলা ভাষায় অন্ত্য বিসর্গ উচ্চারিত হয় না বলে আধুনিক বাংলায় অন্ত্য বিসর্গ বর্জিত হয়েছে। যেমন—আয়ু, সদ্য, বক্ষ, মন, ক্রমশ, ইতস্তত, বিশেষত ইত্যাদি।

২। সাধারণত সমাসবদ্ধ পদে 'শ' 'ষ' 'স' পরে থাকলে বিসর্গ স্বরূপে স্বস্থানে অবস্থান করে। যেমন—নিঃশব্দ, বয়ঃসন্ধি, অন্তঃশীলা, অন্তঃসত্ত্বা, মনঃশিলা, দুঃসাহস, প্রাতঃস্মরণীয়, স্বতঃস্ফূর্ত ইত্যাদি।

৩। 'ক' 'খ' বা 'প' 'ফ' বর্ণ পরে থাকলে অ-কার কিংবা আ-কারের পরস্থিত বিসর্গ সন্ধিবদ্ধ শব্দে 'স' হয়। যেমন—নমস্কার (নমঃ ꠲ কার), পুরস্কার (পুরঃ ꠲ কার), মনস্কামনা (মনঃ꠲ কামনা), বাচস্পতি (বাচঃ ꠲ পতি) ইত্যাদি।

স্বরসন্ধি

১। পূর্বপদের শেষে এবং পরবর্তী পদের শুরুতে যদি একই স্বরবর্ণ (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অবস্থান করে, তবে উভয় অবস্থান মিলে উক্ত স্বরবর্ণ দীর্ঘরূপে রূপান্তরিত হয়। যেমন—অ꠲ অ ঞ্চ আ; বেদান্ত (বেদ꠲ অন্ত), অন্যান্য (অন্য ꠲ অন্য)। অ ꠲ আ ঞ্চ আ; দেবালয় (দেব ꠲ আলয়)। আ ꠲ অ ঞ্চ আ; আশাতিরিক্ত (আশা ꠲ অতিরিক্ত)। আ ꠲ আ ঞ্চ আ; দয়ার্দ্র (দয়া ꠲ আর্দ্র), শিলাসীন (শিলা ꠲ আসীন)। ই ꠲ ই ঞ্চ ঈ; গিরীন্দ্র (গিরি꠲ ইন্দ্র), অভীষ্ট (অভি꠲ ইষ্ট)। ই꠲ঈ ঞ্চ ঈ;প্রতীক্ষা (প্রতি꠲ ঈক্ষা), অধীশ্বর (অধি ꠲ ঈশ্বর)। ঈ ꠲ ই ঞ্চ ঈ;শচীন্দ্র (শচী ꠲ ইন্দ্র)। ঈ ꠲ ঈ ঞ্চ ঈ;সতীশ (সতী꠲ঈশ), রজনীশ (রজনী ꠲ ঈশ)। উ ꠲ উ ঞ্চ ঊ; সূক্ত (সু ꠲ উক্ত), কটূক্তি (কটু ꠲ উক্তি)। উ꠲ ঊ ঞ্চ ঊ; লঘূর্মি (লঘু ꠲ ঊর্মি)। ঊ ꠲ ঊ ঞ্চ ঊ; ভূধর্ব (ভূ ꠲ ঊধর্ব)।

ব্যঞ্জন-সন্ধি

১। স্বরবর্ণ অথবা বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ (গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ) অথবা অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব) পরে থাকলে পূর্ববর্তী 'ক', 'চ', 'ট', 'ত', 'প' যথাক্রমে 'গ', 'জ', 'ড', 'দ' ও 'ব' বর্ণে

পরিণত হয়। যেমন—বাগীশ (বাক্ + ঈশ), বাগীশ্বরী (বাক্ + ঈশ্বরী), দিগন্ত (দিক্ + অন্ত), জগদীশ্বর (জগৎ+ঈশ্বর), দিক্‌গজ (দিক্ + গজ), বাগ্‌জাল (বাক্ + জাল), জগদ্বন্ধু (জগৎ + বন্ধু), উদঘাটন (উৎ + ঘাটন), উদ্ভব (উৎ + ভব), উদ্যোগ (উৎ + যোগ), বাগদত্তা (বাক্ + দত্তা) ইত্যাদি।

২। 'চ' বা 'ছ' পরে থাকলে 'ত্' ও 'দ্' স্থলে 'চ্' হয়। যেমন—সচ্চরিত্র (সৎ + চরিত্র), উচ্ছেদ (উৎ + ছেদ) ইত্যাদি।

৩। 'জ' বা 'ঝ' পরে থাকলে 'ত্'; 'দ্' স্থলে 'জ্' হয়। উজ্জ্বল (উৎ+জল), জগজ্জন (জগৎ + জন), যাবজ্জীবন (যাবৎ + জীবন), তজ্জন্য (তদ্ + জন্য), কুজ্‌ঝটিকা (কুৎ + ঝটিকা) ইত্যাদি।

৪। 'শ' পরে থাকলে 'ত' বর্গের বর্ণের স্থানে 'চ্' হয় এবং উক্ত 'চ' ও 'শ' একত্রে 'চ্ছ'-এ রূপান্তরিত হয়। যেমন—উচ্ছৃঙ্খল (উৎ + শৃঙ্খল), চলচ্ছক্তি (চলৎ + শক্তি), উচ্ছ্বাস (উৎ + শ্বাস) ইত্যাদি।

স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন

১। তৎসম (সংস্কৃত) পুরুষবাচক শব্দের পরে নিম্নলিখিত প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবচক শব্দ গঠিত হয়।

—'আ' যোগে ঃ প্রাচীনা, মহাশয়া, প্রবীণা, নবীনা, সরলা, সেবকা (বাংলায় প্রচলিত 'সেবিকা'), মৃতা, জীবিতা, সুশীলা, সুলোচনা, প্রথমা, দ্বিতীয়া ইত্যাদি।

—'আনী' যোগে ঃ সাধারণত পত্নী অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—ইন্দ্রাণী, মাতুলানী, শিবানী ইত্যাদি।

—'ইকা' যোগে ঃ সাধারণত 'অক' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'অক' স্থানে 'ইকা' হয়। যেমন—নায়িকা, গায়িকা, অধ্যাপিকা, পাচিকা, লেখিকা, পরিচালিকা। ক্ল বাংলায় ক্ষুদ্রার্থেও এই 'ইকা' প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়—নাটিকা, পুস্তিকা, মালিকা, চয়নিকা ইত্যাদি। ব

—'ঈ' যোগে ঃ কুমারী, কিশোরী, নর্তকী, দৌহিত্রী, পিতামহী, বুদ্ধি মতী, ভাগ্যবতী, ষোড়শী ইত্যাদি।

বহুবচনজ্ঞাপক শব্দাবলী

১। বাংলায় নামের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ সংস্কৃত থেকে গৃহীত। এগুলি সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সঙ্গেই যুক্ত হয়, তদ্ভব বা দেশী শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় না। যেমন—আম্রসমূহ, কিন্তু আমগুলো/আমগুলি; বালকবৃন্দ, কিন্তু ছেলেরা/ছেলেগুলি। বা, গুলো, গুলি, দিগ, দিগকে, দিগে (বর্তমানে অপ্রচলিত) ইত্যাদি বাংলা বহুবচনের চিহ্ন।

এছাড়াও বিশেষ্য-বিশেষণ পদগঠন নিয়ে বানানের ক্ষেত্রে বিস্তৃত নিয়মাবলী (প্রায় তিরিশটির মতো) আছে। স্থানাভাবে সেগুলি উল্লেখ করা গেল না।

ক্ল লেখক বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ। ব

সংস্কৃতভারতীর তিরিশ বছর

চ মূ কৃষ্ণশাস্ত্রী

সংস্কৃতভারতী সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রিয় করার জন্য গত তিরিশ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ মানুষ যাতে সহজে কথা বলতে পারে, সংস্কৃত ভাষায় যে বিপুল জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, তা যাতে সহজে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে সংস্কৃতভারতী কাজ করে চলেছে। তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

১। নির্ভয়তা ঃ সংস্কৃত ভাষাতে কথা বলতে গেলে শুদ্ধতা অত্যন্ত আবশ্যক। কিন্তু কথা বলার উৎসাহ যাতে নষ্ট না হয়—সেজন্য সংস্কৃতভারতীর প্রচেষ্টায় আজ অনেকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা বলতে শুরু করেছেন।

২। কথোপকথন ঃ রেল লাইনের বাইরে রেলগাড়ী থাকলে যে দশা হয়, সংস্কৃত ভাষার অনেকটা সেই অবস্থা ছিল। আজ "শ্রবণ" এবং "সম্ভাষণ" এই দুই রেলের উপর সংস্কৃত রথ আরূঢ়। এক কোটি বা তদূর্দ্ধ ভারতীয় এখন কিছু না কিছু কথা সংস্কৃত ভাষাতে বলতে পারেন—বুঝতে তো পারেনই।

৩। সরল সংস্কৃত ঃ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর থেকে সংস্কৃত ভাষাকে সরকারী ভাষা করার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু নীতি নির্ধারকদের মনে একটি অমূলক ধারণা বদ্ধমূল যে—সংস্কৃত অত্যন্ত কঠিন ভাষা। পাণিনি নির্দিষ্ট পথেই সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত সরল। অস্বীকারের কোনও উপায় নেই। সৌভাগ্য যে উত্তরাখণ্ড রাজ্য সরকার সেই প্রদেশের দ্বিতীয় ভাষারূপে সংস্কৃতকে গ্রহণ করেছেন।

৪। সংস্কৃত মাধ্যমে পঠন পাঠন ঃ ইংরেজ এদেশে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করার আগে, সংস্কৃত মাধ্যমেই পাঠদান হোত। সংস্কৃত ভারতীর প্রচেষ্টায়, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে অনেক শিক্ষক সংস্কৃত মাধ্যমে সংস্কৃত পাঠদান করছেন।

৫। নতুন প্রয়োগ/কার্যক্রম ঃ সংস্কৃত চর্চার বহু নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। সম্ভাষণ শিবির, সংস্কৃত সন্ধ্যা, শিবির গুচ্ছ, সংস্কৃত কলম, বীথিনাটক, ক্রীড়োৎসব, চিন্তন চক্র, স্নেহ মিলন, ছাত্র শিল্পশালা, ভারতীপূজা ইত্যাদি।

৬। সংস্কৃত প্রদর্শনী ঃ সংস্কৃতের ব্যবহারিক দিকের পরিচয় করানোর জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন। এছাড়াও সংস্কৃত বিজ্ঞান প্রদর্শনী এবং সংস্কৃত পাঠের বিভিন্ন সাধনসামগ্রীর প্রদর্শনীও চিত্তাকর্ষক ও ফলদায়ী।

৭। তিন হাজার স্থানে কাজ শুরু হয়েছে ঃ সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে সারাদেশে প্রায় তিন হাজার স্থানে সংস্কৃত সেবা কাজের প্রারম্ভ হয়েছে। অসম-মণিপুর-এর মতো বিশেষ পরিস্থিতির প্রদেশেও উল্লেখযোগ্য কার্য বৃদ্ধি ।

৮। সংস্কৃতবর্ষ ঃ ১৯৯২ সালে সংস্কৃতভারতীর নির্ণয় অনুসারে, ২০০০ সাল সংস্কৃতবর্ষ রূপে পালিত হয়।

৯। সংস্কৃত সপ্তাহ ঃ সংস্কৃতবর্ষে, কেন্দ্রিয় সরকার রাখীপূর্ণিমার সপ্তাহকে সংস্কৃত সপ্তাহ রূপে পালনে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১০। সরল সংস্কৃত শিক্ষা কেন্দ্র ঃ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদানের মাধ্যমে এক হাজারেরও অধিক কলেজে এক মাসের সরল সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্র নিয়মিত একবছর প্রচলিত হয়েছে। এজন্য যাবতীয় যোজনা, পুস্তক বা পাঠ্যসামগ্রী নির্মাণ, শিক্ষক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন দায়িত্ব সংস্কৃতভারতী পালন করেছে।

১১। অনৌপচারিক শিক্ষণ কেন্দ্র ঃ যদিও এই শিক্ষণ কেন্দ্রের যোজনা রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত সংস্থার কিন্তু সংস্কৃতভারতী যাবতীয় দায়িত্ব এবং ভূমিকা পালন করেছে।

১২। লক্ষাধিক বই বিক্রয়, এক কোটিরও অধিক আয় ঃ গোরক্ষপুর গীতাপ্রেস-এর সুনাম আছে, বই বিক্রির ব্যাপারে। কিন্তু সংস্কৃত ভারতীর "বদতু সংস্কৃতম্" ও "সংস্কৃত ব্যবহারসাহশ্রী" বই দুটির অতুলনীয় বিক্রি এবং বাণিজ্য দেখার মতো।

১৩। বিশাল জনসভা, সম্মেলন ও শোভাযাত্রা ঃ ব্যাঙ্গালোর, কাশী, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে যে ধরনের বিশাল জনসভা, সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে—দশ হাজারের অধিক জনসমাগম দেখা গেছে। ১৯৯৪ সালে, দিল্লীর তালকোটরা স্টেডিয়ামে পঁয়ত্রিশ হাজার জনসমাগম হয়। সংস্কৃত যে একটি জন আন্দোলন— তা এ থেকে প্রমাণিত হয়।

১৪। কার্যপদ্ধতির বিকাশ ঃ সংস্কৃতভারতীর কাজ করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতির নির্মাণ করা হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে—এই পদ্ধতি অবলম্বনে লক্ষপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

১৫। পৃথিবীর ত্রিশটির বেশি দেশে সংস্কৃত কার্য ঃ আমেরিকা, কানাডা, ইংলণ্ড, মধ্যপ্রাচ্য ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতভারতীর

নিয়মিত কাজ করেছে। এইসব দেশগুলিতে সংস্কৃতভারতীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কার্যকর্তাগণ আছেন।

১৬। হ্রাস বন্ধ ঃ সংস্কৃতের যে হ্রাস গত কয়েকবছর আগেও দেখা যেত—এখন তা একদম বন্ধ। বরং "গ্রাফ" উর্দ্ধমুখী।

১৭। সংস্কৃত সেবায় নিয়োজিত জীবনব্রতী কার্যকর্তা ঃ যাবতীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও, সবকিছু উপেক্ষা করে সংস্কৃত কাজকে নিজ জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছেন—এরকম শতাধিক সেবাব্রতী সংস্কৃত ভারতীর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

১৮। সংগঠন ঃ দেশের সবকটি রাজ্যে, পাঁচশত জেলায় এবং প্রায় আড়াই হাজার স্থানে সংস্কৃতভারতীর সংগঠন জাল ব্যাপ্ত।

১৯। সংস্কৃত চাঁদমামা ঃ শিশুসাহিত্য সংস্কৃত ভাষাতে নিয়মিত গত পঁচিশ বছর ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

২০। সম্ভাষণ সন্দেশ ঃ বহুবর্ণযুক্ত ও আধুনিক বিষয়ের চর্চাসহ নিয়মিত প্রকাশিত মাসিক সংস্কৃত পত্রিকা।

২১। সংসদ ও বিধানসভায় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির ঃ ১৯৮৪ সালে সংসদে এবং তারপর বহু রাজ্যের বিধানসভাতে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির আয়োজিত হয়।

২২। লেখক ঃ সরল সংস্কৃতে লেখালেখি করতে সমর্থ হয়েছেন অনেকে। এঁরাই এখন সংস্কৃতে নতুন সাহিত্য রচনাতে উদ্যোগী হয়েছেন।

২৩। সংবাদশালা ঃ দিল্লীতে প্রতিমাসে প্রতিপক্ষে নবীন ছাত্রদের দু'সপ্তাহব্যাপী আবাসীয় শিক্ষণ গত কয়েক বছর ধরে চলেছে। কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এর দ্বারা লাভবান হয়েছেন।

২৪। সামাজিক সমরসতা ঃ দলিত ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের মধ্যে সংস্কৃতবর্গ সঞ্চালনের নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সংস্কৃতভারতী। বিভিন্ন ভেদভাবনার উর্দ্ধে ওঠার ক্ষেত্রে এধরনের কার্যক্রম অত্যন্ত উত্তম প্রমাণিত হয়েছে।

২৫। সংস্কৃত গৃহ ঃ আজ দেশে বেশ কয়েক হাজার বাড়ীতে পরিবারের সদস্যরা সংস্কৃতভাষাতে নিত্যপ্রতিদিন কথোপকথন করেন।

২৬। সংস্কৃত গ্রাম ঃ সংস্কৃতভারতীর উদ্যোগে বেশ কয়েকটি গ্রাম—সংস্কৃত গ্রামরূপে পরিচিত হয়েছে। আরও কয়েকটি গ্রাম এরকম সংস্কৃত গ্রাম করার লক্ষ্যে অনবরত কাজ চলছে।

২৭। সম্প্রেষণ বিধি ঃ কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদ্ ইদানীং সংস্কৃত পাঠক্রমে "Communicative Approach" নিয়ে আসতে, ছাত্রদের মধ্যে সংস্কৃত অধয়নের উৎসাহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। এই বিষয়ে সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে এবং প্রযত্ন অনস্বীকার্য।

২৮। গীতাশিক্ষণ কেন্দ্রম্ ঃ শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার মাধ্যমে সংস্কৃত পাঠদান।

২৯। সংস্কৃত মাতৃভাষা পরম্পরা ঃ শিশুর জন্ম থেকে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে বেড়ে ওঠাতে বাস্তবিক ভাবে যাতে মাতৃভাষা রূপে সংস্কৃত গ্রহণ করতে পারে—সেরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কৃতভাষা পুনরুজ্জীবনে এর থেকে ভাল মাধ্যম আর হয় না।

৩০। একাসনে একত্রিত হয়ে কাজ করা ঃ সংগঠন শাস্ত্রের মূলমন্ত্র। কোনও ব্যক্তির প্রশংসা, পুরস্কার বা সম্মান নয়। সংস্কৃত ভাষাই পুরস্কৃত হোক্। সংস্কৃত ভারতী নিমিত্তমাত্র। সংস্কৃতভারতীর প্রত্যেক কার্যকর্তা উপকরণ স্বরূপ। বিশ্বসংস্কৃত পুস্তকমেলা—এই ধরনের কাজের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ।

লেখক সংস্কৃতভারতীর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং আচার্য-আচার্যাবৃন্দ।

সংস্কৃত সেবায় নিয়োজিত এক জীবনব্রতী

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিমলা প্রথমে ইংরেজী ভাষায় পড়তে ও পড়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেবভাষা সংস্কৃতেরই হয়ে রয়ে গেলেন। দেবভাষা সংস্কৃতের ও হিন্দু সংস্কৃতিরই প্রতি এমন অনুরাগ জন্মেছিল যে, খৃস্টানী ছেড়ে হিন্দুত্বকে আপন করে নিয়েছিলেন। ৩ অক্টোবর ১৯৮২ সালে ছত্তিশগড়ের তিতরমারা গ্রামে এক খৃস্টান পরিবারে বিমলা পন্নার জন্ম হয়। বিমলাকে তার বাবা-মা ভোপালে ইংরাজী সাহিত্য পড়ার জন্য পাঠায়। কিন্তু স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজী না পাওয়ায় সংস্কৃত নিয়ে ভর্তি হন। তখন সংস্কৃত ভারতীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়। সংস্কৃতে রুচি নির্মাণ হওয়ার কারণে বিমলা সংস্কৃত ভারতী আয়োজিত এক শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ইন্দোরে আয়োজিত ১৫ দিনের শিবিরের পর থেকেই সে সংস্কৃত অনুরাগী হয়ে পড়ে।

বিমলা তিওয়ারী

বিমলা তার ব্যক্তিত্বে নতুন প্রজন্মের জন্য অনেক রাস্তা খুলে দিয়েছেন। সেবা, শিল্প, সম্প্রচার ও ভাষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে এই যুবসমাজকে নতুন ভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন।

বিমলা পন্না দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মিশনারী স্কুলে পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়াশুনা ভোপালের সরকারী স্কুলে হয়েছে। বিমলা হিন্দী ও সংস্কৃত দুটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর। ভোপালের ডিগ্রী কলেজ থেকে বি. এড. করেছেন। ২০০৩ সালে সংস্কৃত বলতে শেখার পর বিমলা পন্না নিশ্চিত করেন যে, অন্যদেরকে সংস্কৃত বলা শেখাবেন। কাজেই সে তিন বছরের জন্য সংস্কৃতের প্রচারিকা হয়ে যান। সংস্কৃত প্রচারের জন্য সে রায়গড়ের ঝিরীগ্রামে যায়। আজ সত্যি সত্যি ঝিরীগ্রাম সংস্কৃত ও সংস্কারময় হয়ে গিয়েছে। ঝিরীগ্রামের লোক মালভী ভাষা জানতো, কিন্তু আজ পরস্পর কথাবার্তা সংস্কৃতে বলছে। বিমলা পন্না ঝিরীগ্রামকে দেববাণী সংস্কৃত গ্রামে পরিণত করেছে। তার হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ জন্মেছে, এর মধ্যে সে নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে এবং এখন ১৫০ পরিবারের ঝিরীগ্রাম পুরোপুরি সংস্কৃত গ্রামে পরিণত হয়েছে। শিশু-বৃদ্ধ ও যুবক সবাই সংস্কৃতেই বার্তালাপ করেন। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই ঝিরীগ্রামেই কালিদাস সংস্কৃত পাঠশালা তৈরি করেছেন। সেখানে আশপাশের ১০-১২টি গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করতে আসে। বিমলা বালিকাদের সংস্কৃতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখে বিভোর হয়ে যান।

বলার প্রয়োজন নেই যে, মধ্যপ্রদেশের এই সংস্কারিত বিমলা তার ব্যক্তিত্বে নতুন প্রজন্মের জন্য অনেক রাস্তা খুলে দিয়েছেন। সেবা, শিল্প, সম্প্রচার ও ভাষার মতো ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে এই যুবসমাজকে নতুনভাবে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণে রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের দিকে যাওয়া যুবকদের দ্বারা দেশে সুরক্ষিত না থাক, কিন্তু সেবা, সংস্কার এবং ভাষা ও সম্প্রচারের মতো ক্ষেত্রগুলিতে কার্যরত এই যুবসমাজের দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই সুরক্ষিত থাকবে। *সৌজন্যে ঃ পাঞ্চ জন্য/৩০.১.১১/পৃষ্ঠা-৭৭*

Swastika RNI No. 5257/57
28 February - 2011, **Sanskrit Spl.**
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

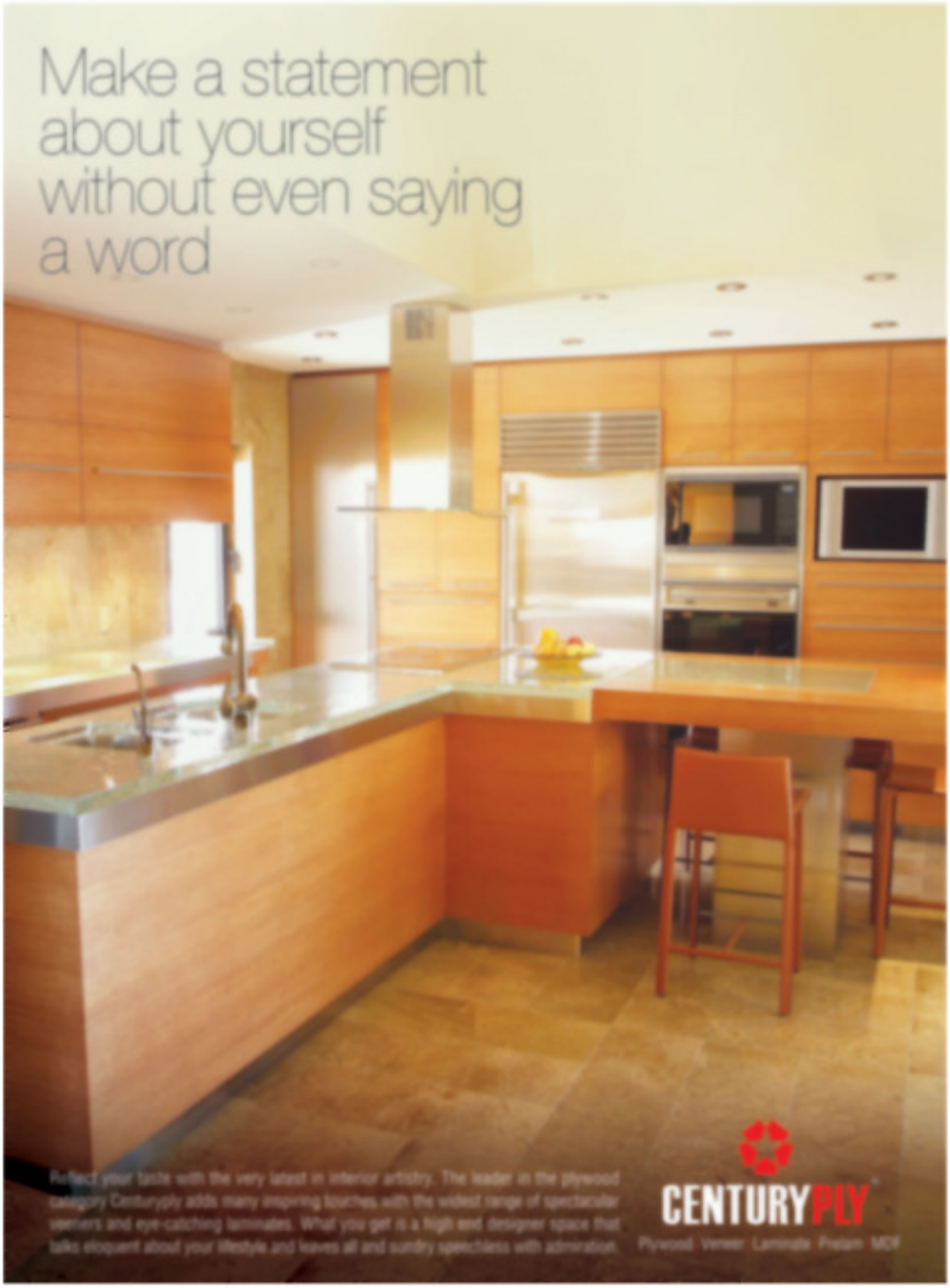

দাম ঃ ৫.০০ টাকা